বাংলাদেশে গারো সমাজের পরিবর্তনের ধারা: একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক:
অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403638

গবেষক:
ফাতেমা ইয়াসমিন
এম. ফিল
রেজি: নং ২২৮
সেশন- ১৯৯৬-৯৭
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
403638
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

403638

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে গারো সমাজের পরিবর্তনের ধারা: একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য "বাংলাদেশে গারো সমাজের পরিবর্তনের ধারা: একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা" শিরোনামে উপস্থাপিত এই গবেষণাটি বা এর অংশ বিশেষ ইতোপূর্বে কোন পত্রিকা বা অন্য কোথাও ছাপানো হয়নি এবং কোথাও ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

403638

অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
চেয়ারম্যান নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ফাতেমা ইয়াসমিন
রেজিঃ ২২৮/১৯৯৬-৯৭
এম. ফিল.
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

গবেষণা একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জ্ঞান অন্বেষণ। বর্তমান গবেষণাটির মাধ্যমে আন্তরিক ও অধ্যাবসায় এর সাথে একটি সত্যকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কতগুলো অনুকল্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। নৃবিজ্ঞান সুশৃংঙ্খলভাবে মানবজাতি এবং এর সমাজ ও সংস্কৃতিকে অধ্যয়ন করে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের এম ফিল পাঠ পরিক্রমের অংশ হিসাবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাটির শিরোনাম "বাংলাদেশে গারো গ্রামের পরিবর্তনের ধারা : একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা"। দশটি অধ্যায়ে গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুকল্প গুরুত্ব, প্রস্তাবনা, সীমাবদ্ধতা, ধারণা সংক্রান্ত কর্মকাঠামো এবং সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা নক্শা, সংখ্যাগত প্রস্তাব, গুনগত প্রস্তাব স্থান নির্বাচন,ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ, নমুনায়ন পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ কৌশল, মূখ্য উৎস, গৌণ উৎস, তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল সমূহ, এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর অবস্থা, গারো জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি, ভৌগলিক এবং সামাজিক অবস্থান, বাংলাদেশ, নেত্রকোনা জেলা, দূর্গাপুর থানা এবং উৎরাইল গ্রাম। চতুর্থ অধ্যায়ে নিবেদিত হয়েছে গারোদের আদিনিবাস, নামকরণ এবং আবাসের ধরণ। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে গারোদের সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে, এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, বিয়ে, পরিবার, গোষ্ঠী সংগঠন, গোত্র ও উপগোত্র সংগঠন এবং কেসস্টাডি সমূহ। ষষ্ঠ অধ্যায়টি নিবেদিত হয়েছে গারোদের অর্থনৈতিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে। এ অধ্যায়ে গারোদের পেশাগত অবস্থা, পেশাগত ক্ষেত্রে গতিশীলতা, অর্থনৈতিক কাঠামো আয়ের উৎস সমূহ এবং গারোদের অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাজনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠনের ধরণ, গারো সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন এবং পরিবর্তনের ধারা। অষ্টম অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে ধর্মবিশ্বাস ব্যবস্থা। গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে। দশম অধ্যায়ে উপসংহারে আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণার প্রেক্ষাপটে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং গবেষণার সারাংশ। এই গবেষণাটি এম ফিল পাঠ্যক্রমের জন্য নির্ধারিত এবং আমার দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের ফলাফল। এই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যারা আমাকে সাহায্য, সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

403638

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সব শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাদের সহযোগীতা না পেলে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ জাহিদুল ইসলামের কাছে। সময়ে-অসময়ে যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি সবসময়ই তিনি সাহায্য সহযোগীতা করেছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, কখনও বিরক্ত হননি। তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময় দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরীকে, এই বিভাগের সকল ছাত্রছাত্রী যার স্নেহ আর্শীবাদে ধন্য।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ডঃ হেলাল উদ্দীন খান শামসুল আরেফিন স্যারকে সবসময়ই তিনি পাশে দাড়িয়েছেন, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার আরও কৃতজ্ঞতা রইল নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানিয়া শারমীন এবং প্রভাষক এসএম আরিফ মাহমুদকে। সবসময়ই তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নেত্রকোনা জেলার পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সুলতান আলমসহ জেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে। "উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী" বিরিসিরি এবং কর্মকর্তা উত্তম কুমার রিছিল, ও সৃজন সাংমাসহ সমগ্র উৎরাইল গ্রামের অধিবাসীদের জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তথ্যসংগ্রহের সময় তাদের সহযোগীতা সাহায্য না পেলে আমার গবেষণা অসম্পূর্ণই থেকে যেত। উৎরাইল গ্রামের অধিবাসীদের সাহায্য, সহযোগীতা, অতিথিয়তার জন্য আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ মহান আল্লাহসহ সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, এবং শুভ্যনুধ্যায়ীদের কাছে। তাদের পরামর্শ, সাহায্য, সহযোগীতা সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমি ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুল থাকলে তার দায়ভার একান্তই আমার। আমি সবার আশীর্বাদ কামনা করছি।

ফাতেমা ইয়াসমিন
এম ফিল (২য় পর্ব)
রেজিঃ- ২২৮
সেশন-১৯৯৬-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়–১: ভূমিকা

১.১। গবেষণার যৌক্তিকতা ২
১.২। গবেষণার উদ্দেশ্য ৪
১.২.১। প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ৫
১.২.২। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ৫
১.৩। গবেষণার অনুকল্প ৫
১.৪। গবেষণার গুরুত্ব ৬
১.৫। গবেষণার প্রস্তাবনা ৭
১.৬। গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৯
১.৭। গবেষণার ধারণা সংক্রান্ত কর্মকাঠামো ১০
১.৮। সাহিত্য এবং গবেষণা পর্যালোচনা ২৮

অধ্যায়-২: গবেষণা পদ্ধতি

২.১। গবেষণা পদ্ধতি..... ৪৯
২.২। গবেষণা নক্শা..... ৪৯
২.২.১। সংখ্যাগত প্রস্তাব ৪৯
২.২.২। গুনগত প্রস্তাব ৫০
২.৩ । স্থান নির্বাচন ৫০
২.৪। ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহ ৫১
২.৫। নমুনায়ন পদ্ধতি ৫৫
২.৬। তথ্য সংগ্রহ কৌশল ৫৭
২.৬.১। মূখ্য উৎস..... ৫৭
২.৬.২। গৌণ উৎস ৫৭
২.৭। তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল সমূহ ৬০
২.৮। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ৬১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩: বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী

৩.১। বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর অবস্থা ৬৩
৩.২। গারো জনগোষ্ঠীর প্রতিকৃতি ৬৭
৩.৩। ভৌগলিক এবং সামাজিক অবস্থান ৬৮
৩.৪। বাংলাদেশ ৬৯
৩.৪.১। নেত্রকোনা জেলা ৭৪
৩.৪.২। দূর্গাপুর থানা (উপজেলা) ৭৬
৩.৪.৩। উৎরাইল গ্রাম ৭৭

অধ্যায়-৪: গারো আদিনিবাস, নামকরণ এবং আবাসের ধরন

৪.১। উৎপত্তি ৮২
৪.২। নামকরণ..... ৮৩
৪.৩। ভাষা ৮৪
৪.৪। গারোদের আবাসের ধরন ৮৪
৪.৫। গারোদের বর্তমান গৃহস্থালীর ধরন ৮৫

অধ্যায়-৫: সামাজিক সংগঠন

৫.১। বিয়ে ৯০
৫.২। পরিবার ৯৬
৫.৩। গোষ্ঠী সংগঠন ১০৩
৫.৪। গোত্র সংগঠন ১০৪
৫.৫। উপগোত্র সংগঠন ১০৯
৫.৬। কেস স্টাডি ১১০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬: অর্থনৈতিক সংগঠণ

৬.১। পেশাগত অবস্থা ১১৫

৬.২। ঐতিহ্যবাহী পেশা ১১৫

৬.৩। পেশাগত ক্ষেত্রে গতিশীলতা ১১৬

৬.৪। অর্থনৈতিক কাঠামো ১১৮

৬.৪.১। আয়ের উৎস সমূহ ১১৮

৬.৫। গারো অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তনের ধারা ১২০

অধ্যায়-৭: রাজনৈতিক সংগঠণ

৭.১। রাজনৈতিক সংগঠণ ১২১

৭.২। রাজনৈতিক সংগঠণের ধরণ ১২১

৭.৩। গারো সমাজে রাজনৈতিক সংগঠণ ১২৪

৭.৪। রাজনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তনের ধারা ১২৪

অধ্যায়-৮: ধর্ম বিশ্বাস ব্যবস্থা

৮.১। ধর্মের সংজ্ঞা ১২৫

৮.২। গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মাবিশ্বাস ১২৫

৮.৩। ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান সমূহ ১২৭

৮.৪। ধর্মীয় পুরোহিত ১২৯

৮.৫। গারো সমাজে অন্ধবিশ্বাস ১২৯

৮.৬। পরিবর্তনের ধারা ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৯ কৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবন

৯.১। খাদ্যভ্যাস ১৩১

৯.১.১। খাদ্যভ্যাসে পরিবর্তনের ধারা ১৩২

৯.২। তৈজসপত্র ১৩২

৯.২.১। তৈজসপত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩২

৯.৩। আসবাবপত্র ১৩৩

৯.৩.১। আসবাবপত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩৩

৯.৪। পোষাক ১৩৩

৯.৪.১। পোষাকে পরিবর্তনের ধারা ১৩৩

৯.৫। অলংকার ১৩৪

৯.৫.১। অলংকারে পরিবর্তনের ধারা ১৩৪

৯.৬। চিকিৎসা ১৩৪

৯.৬.১। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩৫

৯.৭। শিক্ষা ১৩৫

৯.৭.১। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩৬

৯.৮। বিনোদন ১৩৬

৯.৮.১। বিনোদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩৬

৯.৯। নগর সংস্পর্শ ১৩৬

৯.৯.১। নগর সংস্পর্শের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩৭

৯.১০। শিল্প, সাহিত্য ও অবস্তুগত সংস্কৃতি ১৩৭

৯.১০.১। শিল্প, সাহিত্য ও অবস্তুগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা ১৩৮

অধ্যায়-১০ উপসংহার ১৩৯

গ্রন্থপুঞ্জি ১৪৬

পরিশিষ্ট-১..... ১৫৪

পরিশিষ্ট-২..... ১৬০-১৬১

Dhaka University Institutional Repository

সারণীর পৃষ্ঠা নং

সারণী-১ ..... ৭২
সারণী-২ ..... ৭৯
সারণী-৩ ..... ৭৯
সারণী-৪ ..... ৮০
সারণী-৫ ..... ৮০
সারণী-৬ ..... ৮৬
সারণী-৭ ..... ৮৬
সারণী-৮ ..... ৮৭
সারণী-৯ ..... ৯৩
সারণী-১০ ..... ৯৩
সারণী-১১ ..... ৯৪
সারণী-১২ ..... ৯৮
সারণী-১৩ ..... ৯৯
সারণী-১৪ ..... ৯৯
সারণী-১৫ ..... ১০০
সারণী-১৬ ..... ১০৫
সারণী-১৭ ..... ১০৫
সারণী-১৮ ..... ১০৮
সারণী-১৯ ..... ১১৬
সারণী-২০ ..... ১১৭
সারণী-২১ ..... ১১৯
সারণী-২২ ..... ১২৭
সারণী-২৩ ..... ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাপের পৃষ্ঠা নং

ম্যাপ-১ ..... ৮৮

ম্যাপ-২ ..... ৮৯

তালিকার পৃষ্ঠা নং

তালিকা-১ ..... ৬৪-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-এক

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিচিত্র নৃগোষ্ঠীর এক বিশাল ব-দ্বীপ। এখানে বৃহত্তর নৃগোষ্ঠীর সাথে সাথে নানা ধর্মের ও নানা বর্ণের নৃগোষ্ঠী একত্রে বসবাস করছে। সবাই মিলেমিশে হয়েছে বাংলাদেশী। বিশাল সংখ্যক নৃগোষ্ঠীর সাথে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো তাদের নিজস্ব জাতিস্বত্ত্বা এবং ঐতিহ্য নিয়ে টিকে আছে।

বাংলাদেশ ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি ছোট দেশ। মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটির উপর (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরীপ, ২০০১)। বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য একে নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের স্বর্গভূমি বলা যায়। এদেশে বসবাসরত বহুসংখ্যক নৃগোষ্ঠীর আছে সুদূর অতীতের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। এই নৃগোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে একটা নতুন মাত্রা প্রদান করেছে এবং একটি নিজস্ব জাতিস্বত্তার ভিত্তিতে এরা সমতলভূমির বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

২০০১ সনের পরিসংখ্যান জরীপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩৬টি নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধানত যাদের নাম করা যায় তারা হচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, খাসী, রাজবংশী এবং হাজং প্রমুখ। দেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হচ্ছে ১২,০৫,৯৭৮ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০০২: ৩৩)। এই সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১.১৩ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে (ইসলাম, ১৯৮৬)। বর্তমান বিশ্বে গারো নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ৮,৫০,০০০ জন। একটি বেসরকারী পরিসংখ্যানে জানা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে গারো জনসংখ্যা প্রায় ১,১৬,০০০ (ইসলাম, ১৯৮৯: ১৬৪) এবং সংখ্যাগতভাবে বাংলাদেশের সকল নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এদের অবস্থান পঞ্চম। বাংলাদেশ জাতীয় গারো কাউন্সিল এর সভাপতি জেমস রুবামের মতে বেসরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের গারো জনসংখ্যা ১২,৫০০ জনেরও বেশী হবে (Essays on Garo Society, edited in September 2002; Birisiri, Netrokona, 6)।

গারো হলো বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নৃগোষ্ঠী। এ গোষ্ঠীটি শত শত বছর ধরে এদেশে বসবাস করছে। অনেকে মনে করেন গারো জনগোষ্ঠীর নামানুসারে গারো পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছে (বোনার্জীর বি, ১৯২৯; খালেক, ১৯৮৩: ৩৪)। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে গারোরা প্রধানত বাংলাদেশের ৮টি জেলায় ছড়িয়ে আছে, তবে তারা প্রধানত সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করছে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর এবং নেত্রকোনা জেলায়। ঐতিহ্যগতভাবে গারোরা বনাঞ্চলের বাসিন্দা এবং জুমচাষ, শিকার, খাদ্যসংগ্রহ ও মৎস শিকারের উপর নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

গারোদের সামাজিক কাঠামো মাতৃতান্ত্রিক এবং তারা মাতৃস্থানীয় জনগোষ্ঠী। তাদের এই নিজস্বতা তাদেরকে একটি "স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য" প্রদান করেছে যা অন্যান্য নৃগোষ্ঠী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গারোদের অনেক সময় "মান্দি" নামে চিহ্নিত করা হয় এবং তারা নিজেরাও মান্দি নামে নিজেদের পরিচয় দিতে বেশী পছন্দ করে। যেখানে মান্দি অর্থ মানুষ (রহমান, ১৯৯২ঃ২)। এই সহজাত জনগোষ্ঠীর রয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি, সামাজিক কাঠামো, প্রথা, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, আইন ও তার প্রয়োগ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি। সময়ের পরিক্রমায় আধুনিকতা এবং বিশ্বায়নের সংস্পর্শে এসে তাদের এই নিজস্ব জাতিসত্তা বিচ্যুতি এবং রুপান্তরের পথে আছে। যাইহোক, বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশের গারো সমাজেও প্রতিনিয়ত রূপান্তর এবং পরিবর্তন ঘটছে। গারো সমাজ কাঠামোতে অভ্যন্তরীন এবং বর্হিবিশ্বীয় এই দুই ধরনের চাপই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এই নৃগোষ্ঠীগুলোর সমস্যাসমূহ দূর করার ক্ষেত্রে প্রধানত সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। তাই তাদের বর্তমান অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, জীবন যাপনের ধরণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাটি, "বাংলাদেশে গারো সমাজের পরিবর্তনের ধারা": একটি নৃবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা "Changes among the Garo Society in Bangladesh": An Anthropological Study) তাই তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ। গবেষণাটি সুগভীরভাবে গারো নৃগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবির রূপরেখা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির আলোকে গারোদের রুপান্তর (transition) প্রক্রিয়াটি আলোচ্য গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণাটিতে তাদের সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমগুলোকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষত সে সব মিথস্ক্রিয়া যেগুলো সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে যেমন নগরায়ন, আধুনিকায়ন, এবং গারোদের ক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ। এই গবেষণাটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কোন কোন প্রভাব এবং অভিঘাত (impact) এর মধ্যে দিয়ে গারোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। এটিই মূলত এই গবেষণাটির প্রধান বিষয়।

১.১। গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রাথমিকভাবে বলা যায়, গারো আদিবাসীগোষ্ঠীকে নিয়ে বেশ কিছু গুনগত মান সম্পন্ন গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু গারোদের পরিবর্তন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা খুবই অপ্রতুল। একজন গবেষক হিসাবে আমি এখানে গারোদের ঐতিহ্য এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মনির্ভরশীল, আত্মকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলো বর্তমানে তাদের আদিম এবং ঐতিহ্যগত

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ কাঠামো হারাচ্ছে এবং সেই সাথে তারা সম্পূর্ণ পৃথক একটি সাংস্কৃতিক বলয়ের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলন এবং পরিবর্তনের চাপে তারা পরিবর্তিত হতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিবর্তনসমূহ তাদের মানবিক সম্পর্ক এবং উপযোজনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমান সময়ে তাদের পরিবর্তনের প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও বিন্যাস এবং আধুনকি গণমাধ্যম, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভাব ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) সম্পর্কে অহেতুক ভয় এবং ঘৃণা থেকে তারা বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে তাদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য আভ্যন্তরীন সামাজিক আন্দোলন, অন্যদিকে তারা আন্দোলিত হচ্ছে আধুনিকায়ন এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির দ্বারা। এই অবস্থাটি অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহেও লক্ষ্যণীয়। সাধারণভাবে বলা যায়, সব সমাজের মতো আদিবাসী সমাজও একটি পরিবর্তনশীল সমাজ। বাংলাদেশের গারো সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়।

গারোদের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি, পৃথক ভাষা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং আদর্শ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাপে ও অন্যান্য কারণে তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং আদি সত্ত্বা হারাতে চলেছে। অন্য কথায় বলা যায়, তাদের অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র অন্তরায়ন (internment), ঐতিহ্য এবং অন্যান্য পরিচয় আজ বহুমূখী চাপে হুমকির সম্মুখীন। এখন সময় এসেছে তাদের নথিপত্র, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং জীবন প্রণালীকে সংরক্ষণ করার।

নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি যত দ্রুত সম্ভব তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই স্বতন্ত্র গারো সংস্কৃতিকে জানা এবং সংরক্ষনের জন্য এই আদিবাসীগোষ্ঠীকে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জানা একান্ত প্রয়োজন।

আবারও বলতে হয় এই গবেষণাটি গারো জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রূপরেখা প্রদান করবে। যেমন তাদের সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন, বিশ্বাস ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, তাদের আদর্শ, আনুষ্ঠানিকতা, লৌকগাথা, মিথ, লৌকিক উপাখ্যান প্রভৃতি। সন্দেহাতীতভাবে বিষয়গুলো এই স্বদেশজাত গোষ্ঠী সম্পর্কে, বিশেষত গারো নৃগোষ্ঠীকে, জানা এবং বোঝার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের, পাঠক ও গবেষকদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গারো জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর খুবই ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তা সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব কিছু সমস্যা এবং কিছু দাবী আছে । সরকারী নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, এবং গবেষকগণ এই গবেষণাটির মাধ্যমে কিছুটা দিকনির্দেশনা পাবেন। কারণ কোন গোষ্ঠী সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে সেই গোষ্ঠী সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষত গারোদের সম্পর্কে জানা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা মাতৃতান্ত্রিক নৃগোষ্ঠী, যা তাদের অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহ থেকে পৃথক এবং যা তাদেরকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এই গবেষণাটি সচেতন জনগণের মাঝে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি এটা গারো জনগোষ্ঠীরও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমি মনে করি। বর্তমানে যেভাবে তাদের পরিচয় এবং নিজস্বতা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গারোদের নিজস্বতা ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার এবং সে বিষয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন অপরিহার্য।

মানুষের জানার, শিক্ষার, পর্যবেক্ষনের এবং আত্মস্থ করার অনেক বিষয় আছে। বর্তমান গবেষণাটির বিশেষ শিক্ষনীয় গুরুত্ব আছে এমন দাবি আমি করি না, তবে শুধু এটুকু বলতে পারি যে এই গবেষণাটি সবার মধ্যে স্বদেশীয় সহজ সরল মানুষদের সম্পর্কে জানার একটি আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করবে এবং একই সঙ্গে তাদের উন্নয়নকল্পে বিশেষ অবদান রাখতে সহায়ক হবে। আমি আরও আশা করি এই গবেষণাটি এই জনগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করে তাদের বুঝতে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা কিভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে সে বিষয়ের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে সহায়ক হবে।

১.২। গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণাটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে একটি আদিবাসীগোষ্ঠীর জীবনযাপনের ধরন (Lifestyle) এর একটি চিত্র তুলে ধরা এ গবেষণার উদ্দেশ্য। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে এই গবেষণাটিতে আদিবাসীদের মধ্যে দ্রুত ঘটে যাওয়া এবং ঘটমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় আরও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে কিভাবে এই ঐতিহ্যবাহী সমাজটি বর্তমান পরিবর্তনসমূহ গ্রহণ করে ক্রমশ জটিল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আলোচনার এবং বুঝার সুবিধার্থে এই গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; একটি হলো প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ এবং অন্যটি হলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

১.২.১। প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ

গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে যে সকল প্রধান উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো -

১. বর্তমান পরিস্থিতিতে গারোদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

২. এই নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা যেমন পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতি সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি।

৩. বর্তমানে এই নৃগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রক্রিয়ায় নগরায়ন, আধুনিকায়ন, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন, গণমাধ্যমের প্রভাব, খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ, ক্রমবর্ধমান নগর সান্নিধ্য, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্যাটেলাইট সংস্কৃতি প্রভৃতি কি ধরনের প্রভাব রাখছে তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করা।

১.২.২। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

আলোচনার সুবিধার জন্য আরও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ চয়ন করা হয়েছে এবং এগুলো হলো-

১. গারোদের সামাজিক সংগঠন;

২. বিশ্বাস পদ্ধতি;

৩. পেশা;

৪. বিবাহ প্রথা, জ্ঞাতি সম্পর্ক ও জ্ঞাতিতাত্ত্বিক পটভূমি।

৫. রাজনৈতিক সংগঠন;

৬. তাদের আবাসনের প্রকৃতি;

৭. তাদের অর্থনীতি (মূলত তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা এবং বর্তমান পেশা), আয় ও ব্যয়;

৮. বৃহত্তর সমাজের সাথে তাদের সম্পর্ক; এবং

৯. বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং বহির্বিশ্ব থেকে তাদের আত্মস্থ করার ধরন।

১.৩। গবেষণার অনুকল্প

একটি নৃগোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র গবেষণাটি অনুসন্ধানমূলক এবং বর্ণনাত্মক প্রকৃতির। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তন তুলে ধরা। এই গবেষণাটির আরও একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এখানে বৃহত্তর সমাজের সাথে গারো সমাজের সংহতি এবং স্বতন্ত্রতার বিষয়টি সন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধভাবে এখানে আরও অনুসন্ধানের চেষ্টা ছিল কিভাবে এবং কোন পন্থায় এই ঐতিহ্যবাহী মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজ আধুনিক পরিবর্তনশীল চাপের সম্মুখে প্রতিক্রিয়া করছে। এই পথ ধরে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে সঠিক নির্দেশনার উদ্দেশ্যে কিছু অনুকল্প গঠন করা হয়েছে। এগুলো হলো-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী একটি রূপান্তর (transition) প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিভিন্ন চাপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। যেমন - শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা-বিস্তার, খৃষ্টধর্ম, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তৃতি।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী দৃশ্যত তাদের ঐতিহ্যবাহী গোত্র, পরিবার এবং বিশ্বাস প্রথাকে হারাচ্ছে।

তৃতীয়ত: বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হারাচ্ছে। তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত গণমাধ্যম, নগরসংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতির দিকে বেশী উন্মোচিত হচ্ছে।

চতুর্থত: ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে যদিও গারোরা খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছে তথাপি তারা তাদের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ, আনুষ্ঠানিকতা, রীতি-নীতি ও ব্যবহার ধরে রাখতে সচেষ্ট হচ্ছে।

১.৪। গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণাটি বাংলাদেশের গ্রামীন গারো জীবনকে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। যে স্থানটি গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সেটি একটি শহরের প্রান্তে অবস্থিত। এই গ্রামটি শহরের প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় গারো জীবনে পরিবর্তন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করতে সুবিধা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল থেকে এই গ্রামে গারো নৃগোষ্ঠী বংশ-পরম্পরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ফলে আধুনিকতার সাথে সাথে এখানে ঐতিহ্যবাহী গারো সামাজের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। গারো জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে অংশগ্রহণ করা হয়েছে তাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে গারোরা কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হচ্ছে তা গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা। এই গবেষণাটিতে দশ মাস মাঠ পর্যায়ে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সময়ের সঠিক চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রামে মোট ১১৪টি গারো গৃহস্থালী আছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক নৃগোষ্ঠী বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে যাদের সম্পর্কে এখনও নৃবৈজ্ঞানিকভাবে বেশী কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার নৃগোষ্ঠীগুলোর সমস্যাসমূহ অনুধাবন এবং এগুলোর সমাধানের বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলো চেষ্টা করছে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে। বর্তমানে আদিবাসীদের সমস্যা নিরুপণ, সমাধান এবং

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন যা সময়োপযোগী এবং কার্যপোযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়াও বর্তমান পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্য সংরক্ষণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিশেষত তাদের অস্তিত্ব আজ বিলীন হওয়ার পথে। মূলত নৃবিজ্ঞানীদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এই আদিবাসী নৃগোষ্ঠীগুলোর জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান গবেষণাটি কতিপয় ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। প্রথমতঃ গারো আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের অন্যতম এই বৃহত্তর নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে বিলীন হওয়ার পথে সে সম্পর্কে সাধারণ জনগোষ্ঠী এবং এমনকি গারো জনগোষ্ঠীর মধ্যেও সচেতনা সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে। সর্বোপরি, এই গবেষণাটি পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, নীতিনির্ধারক, এবং উন্নয়ন চিন্তাবিদের মাঝে কিছু তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমান গবেষণাটি এই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর অনুসন্ধানমূলক একটি অনুক্রমন গবেষণা। এটা সন্দেহাতিত ভাবে বলা যায় যে এটি পাঠক ও নবাগত গবেষকদের মাঝে গবেষণার একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। মাঠপর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রমের বিভিন্ন সময়ে অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদানসমূহ সংগ্রহ এবং যাচাইয়ের পর যে তথ্যসমূহ সংযুক্ত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি যথার্থ উৎকর্ষতার দাবী রাখে।

১.৫। গবেষণার প্রস্তাবনা

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মতো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহ প্রতিনিয়ত একটি পরিবর্তন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আভ্যন্তরীন এবং বর্হিবিশ্বের দ্বিবিধ চাপই এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। যদিও এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে এই পরিবর্তনশীলতার কারণগুলোর মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তবে এটা সব সমাজের ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট যে আদিবাসী সমাজগুলো এক রকম পরিবর্তনশীল চাপের মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে অতিক্রান্ত করছে। বর্তমান গবেষণাটি একটি ক্ষুদ্র পরিসরে গারো সমাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী সুদৃঢ় বুননে একটি মাতৃতান্ত্রিক সামাজিক গোষ্ঠী। এই গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে যে গারো আদিবাসীগোষ্ঠী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ডঃ ইসলাম (১৯৮৬) তার পি. এইচ. ডি থিসিসে উল্লেখ করেছেন গারোরা যদিও এখনও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূত (assimilated) হয় নাই তথাপি তাদের মধ্যকার পরিবর্তনশীলতা বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাদের একাত্ব করেছে। আরও বলা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, এই অবস্থা তাদেরকে একদিকে যেমন একটি নতুন মূল্যবোধ ও কাঙ্ক্ষিত কক্ষপথে নিক্ষেপ করেছে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন পরিবর্তনশীল চাপসমূহকে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে (ইসলাম, ১৯৮৬: ৪)।

আঞ্চলিকভাবে গারো আদিবাসীগোষ্ঠী দেশের প্রধানত ৮টি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে। এগুলো হল ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, রংপুর এবং সিলেট। ডঃ ইসলাম (১৯৮৬) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে ময়মনসিংহ জেলাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক গারো (আনুমানিক ৬০,০০০) বসবাস করে (ইসলাম, ১৯৮৬, ৪)। গারোরা প্রধানত বনাঞ্চলের অধিবাসী এবং জীবিকার জন্য এরা জুম চাষ এর উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি এরা পশু শিকার, মৎস্য শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। এরা উত্তরাধিকার এবং বংশমর্যাদার ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক ধারার এবং আবাসনের দিক থেকে মাতৃস্থানীয় ধারার অধিকারী যা তাদেরকে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে।

ড. ইসলাম (১৯৮৬) মনে করেন বাংলাদেশের গারো আদিবাসীগোষ্ঠী রূপান্তর প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বহির্বিশ্বীয় এবং আভ্যন্তরীন উভয় ধরনের চাপই এই পরিবর্তনেক প্রভাবিত করছে। আভ্যন্তরীন চাপগুলো হলো বাস্তবিক প্রয়োজন, জুম চাষ, ভাল চাষযোগ্য জমির খোঁজ করা প্রভৃতি। ডঃ ইসলাম গারো নৃগোষ্ঠীর পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় যে কারণগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত। বর্তমানে আরও কিছু কারণ এর সাথে যোগ হয়েছে। যেমন-গণমাধ্যমসমূহের প্রভাব ও স্যাটেলাইট সংস্কৃতি। বহির্বিশ্বীয় কারণ সমূহ আবার দু-ধরনের: প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ কারণগুলো হলো-

(ক) জুম চাষ নিষিদ্ধকরন।

(খ) বনাঞ্চল সমূহকে সরকারের নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা।

(গ) শিক্ষাবিস্তার।

(ঘ) বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।

(ঙ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

(চ) ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের প্রভাব।

(ছ) রাজনৈতিক গোলযোগ।

(জ) স্থানীয় সরকারে গায়োদের উপস্থিতি।

পরোক্ষ চাপগুলো সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এগুলো হলো -

(ক) নগরায়নের প্রভাব।

(খ) শিল্পায়নের প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আধুনিকায়ন।

(ঘ) বিশ্বায়ন।

(ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।

(চ) গণমাধ্যম সমূহের প্রভাব।

(ছ) স্যাটেলাইট সংস্কৃতির প্রভাব।

১.৬। গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন অচেনা জায়গায় একটি গবেষণা করতে গেলে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। একজন গবেষক কখনই এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারেন না, এইসব অসুবিধা মোকাবেলা করেই তাঁকে গবেষণা পরিচালনা করতে হয়। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপী পরিচালিত হয়, এটা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই গবেষণাটি যদিও নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে তারপরও আমি মনে করি মাঠপর্যায়ের কাজে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও সময় নিতে পারলে ভাল হতো।

আমি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই গারো আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন লিখিত ইতিহাস নেই। গ্রামবাসীরা স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় এই নব্য শিক্ষিত গারো গ্রামবাসীরা তাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য দিতে পারেনি। তাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে, অনেক সময়ই সেটা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। মাঠ পর্যায়ের কাজের সময় রোদের প্রখরতা, তাপদাহ এবং প্রচন্ড শীত প্রায়ই আমাকে অসুবিধার সম্মুখীন করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনুভব করি আমার শিশু সন্তানটি সে সময় খুবই ছোট থাকায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে যথেষ্ট কষ্ট করেছে, যা একজন মা হিসাবে আমাকে খুবই ব্যাথীত করেছে, একই সাথে তার অসুস্থ্যতা আমার কাজেও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। কাজের সময় আমি যে বাংলোটিতে থাকতাম সেটা সোমেশ্বরী নদীর অপর পারে অবস্থিত। প্রতিদিন বেশ কয়েকবার নদী পার হয়ে আমাকে এপারে আসতে হতো। বৃষ্টির দিনে বিশেষ করে নদীতে যখন স্রোত খুব বেশী থাকত সে সময় নদী পার হওয়া আমার কাছে খুবই বিপদ সঙ্কুল মনে হতো। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার সময় এসব বিষয় আমার জন্য পীড়াদায়ক ছিল। যদিও যে কোন গবেষণা কর্ম পরিচালনা করার সময় ব্যক্তিগতভাবে আবেগতাড়িত হওয়া উচিত না। তবুও একটি বিষয় এখানে না উল্লেখ করে পারছি না তা হচ্ছে এই গবেষণাটির মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করার পর পরই আমার সন্তানটি ভূমিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সে ভূমিষ্ট হওয়ায় তার সঠিক যত্ন ও লালনপালনের জন্যে বেশ কিছুদিন গবেষণা কাজটি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। শিশুটি একটু বড় হলে (দুই বৎসর) আমি আবার কাজে যোগদান করি এ সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সড়ক দূর্ঘটনায় আমার বাবা মারা যান। পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান হওয়ায় আমি বাবার খুব কাছাকাছি ছিলাম। এই ঘটনাটি আমাকে

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকভাবে খুবই আঘাত করে। এর কিছুদিন পরই আমার বৈবাহিক জীবনের অবসান ঘটে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনা এবং দূর্ঘটনাগুলো মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কাজে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। মানসিক বিপর্যস্ততা কাটিয়ে উঠতে আমার যথেষ্ট সময় লেগেছে। এই পর্যায়ে আমার কাছে সব কিছুই অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও দুর্বিসহ মনে হয়েছে। এরপর আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি ধৈর্য্য ধরে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে আন্তরিকভাবে গবেষণাটি পরিচালনা করতে।

একজন গবেষক হিসাবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সব ধরনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে। সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি প্রায়ই নির্বাচিত স্থানে যেতাম। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি প্রথমে গ্রামবাসীদের সাথে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগীতামূলক সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছি। তারা আমাকে হাসিমুখে সাদরে গ্রহণ করেছে, আপ্যায়িত করেছে। ক্রমে ক্রমে তারা আমাকে পরিবারের একজন বন্ধু হিসাবে তাদের আনন্দ বেদনার অনুভূতিগুলো আমার সাথে আলোচনা ও বিনিময় করেছে যার মানবিক আবেদন আমার কাছে অপরিসীম। মাঠ পর্যায়ের এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে আনন্দের স্মৃতি। সর্বোপরি, আমি বহুবিধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুরো গবেষণাটি যথাসাধ্য নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছি।

১.৭। গবেষণার ধারণা সংক্রান্ত কর্মকাঠামো

বর্তমানে 'আদিবাসী' অথবা "আদিবাসীয়" প্রত্যয়টি একটি বিশেষ মনো-সামাজিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সাধারণভাবে আদিবাসী সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা তা হলো মানুষের আদিম সামাজিক ইতিহাসের সমষ্টি। "আদিবাসী" শব্দটি আজ সর্বসম্মতভাবে সুশীল সমাজে গৃহীত। কিছুদিন পূর্বেও "উপজাতি" শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হতো। আমরা প্রথমে জানতে চেষ্টা করবো "উপজাতি" বলতে কাদের বোঝান হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা জানব "আদিবাসী" শব্দটি বর্তমানে কি অর্থ বহন করে থাকে।

নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের উভয়ই উপজাতির সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞা আমরা আজও খুঁজে পাই নাই। এ প্রসঙ্গে মজুমদার বলেছেন যে এমনকি আজও উপজাতির (tribe) কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই (মজুমদার, ১৯৭২: ৬৬)। দুবে মনে করেন, "উপজাতি শব্দটিকে যথাযথভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় নাই। এটা ছিল বিশেষণটির পরিভাষা এবং সংশোধিত রূপ যা এক সময় বিচিত্র সামাজিক প্রণালীর প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হতো, সেটা কোনটার সাথে সাদৃশ্যে নয় বা তুলনায় নয়। পরবর্তীতে এটা ব্যবহৃত হয়েছে আদিবাসী এবং আদিম গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে। যাহোক, কোনভাবেই উপজাতিয়তাকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় নাই। এটা উপজাতির প্রতীক হিসাবে বিশ্বে, নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে, উদ্বৃত" (দুবে,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭:২)। [(The term tribe has never been defined precisely and satisfactorily. It was nomenelature and modification of adjectives which at one time denoted a variety of social catagories, that were neither analogues nor comparable. In later usage it is the aboriginal and the primitive groups. At no stage, however did as have a set of clear indicators of tribaless, which tended to see the tribes in the world particularly in context of India" (Dube, 1977:2)]।

রাগভির মতে "উপজাতি শব্দটির যে কোন ভাবেই হোক কিছু সংজ্ঞা আছে। সম্প্রদায়সমূহ যখন সংজ্ঞার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখায় তখন উপজাতি শব্দটির একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা কেবল উপজাতির বৈশিষ্ট্যবলীর কথাই বলতে পারি, যদিও আমরা নামমাত্র একটি উপজাতিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি" (রাগভি, ১৯৬৯:১)। [(The word 'tribe' somehow includes difination. As the communities tend to out-grow defmations, it is very difficult to evolve a commaul acceptable definition of a tribe. We can atleast name tribal characteristics though we can hardly define a tribe" (Raghaviah 1969:1)]।

অক্সফোর্ড ডিকশোনারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী উপজাতি হচ্ছে "কোন প্রধান এর অধীনে আদিম অথবা অসভ্য জনগোষ্ঠী" (সম্পাদিত; ১৯৯৫: ১২৭৫)। [(Any primitive barbarous people under a chief (Dic. of Oxford, Ed, 1995: 1275)]। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা "উপজাতি" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে "কতগুলো পরিবার অথবা ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সমূহকে তখনই সাংবিধানিকভাবে একটি উপজাতি বলা যায় যখন একই রকম পূর্বপূরুষ থেকে তাদের বংশধররা চিহ্নিত করতে পারে" (সম্পাদিত, ১৯৭৪: ৯৮০) [(The families or small communities that eonsititute a tribe are said to trace their descent from common ancestor" (Edit, 1974: 980)]।

যাহোক, আদিবাসীদের নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন এমন সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে "তারা (উপজাতি).... একই সমাজ ব্যবস্থায় অন্যদের থেকে আলাদা। তারা তাদের নিজস্ব বিবাহ রীতিনীতিকে ধারণ করে রেখেছে; তাদের প্রায় সবাই তাদের নিজেদের সীমাবদ্ধ স্থানীয় দলের মধ্যে বিবাহ করে এবং মাঝেমধ্যে তারা আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের বয়জ্যেষ্ঠ বা রাজনৈতিক প্রধানদের দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্য কথায়, তারা সামাজিকভাবে পৃথক সম্প্রদায় গঠন করে যাদেরকে উপজাতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বিশেষ বিবেচনার জন্য একটি তালিকায় অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে, যাতে করে তারা খুব স্বল্প সময়ে ভারতের মূল স্রোতধারার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে পারে" (বোস, ১৯৭১:৪)। [('They (the tribe).... differ from other in the social systems. They have retained their own marriage regulations; nearly all marry within their restricted

Dhaka University Institutional Repository

local group, and are sometimes guided by their own elders or political chiefs in internal and external affairs. In other words they form socially distinct communities who have been designated as tribes and listed in a schedule for special treatment, so that within a relatively short time they can come within the mainstream of the political and economic life of India" (Bose, 1971:4)]।

ইমপেরিয়াল গেজেটিয়ার ইন্ডিয়া অনুসারে "একটি উপজাতি হচ্ছে কতগুলো পরিবারের সমষ্টি যারা একটি সাধারণ নাম বহন করে, একই ভাষায় কথা বলে, সাধারণত একই অঞ্চলে জীবন-যাপন করে, পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকে, এবং এই অধিবাসীরা সাধারণত অন্তর্গামী নয়, যদিও মৌলিকভাবে এটাকে তাই মনে করা হতো" (বিসিএলেন, ১৯০৯)। [("A tribe is a collection of families bearing a common name, speaking a common dialact, occupying or professing to occupy a common territory and is not usually endogamous, though originality it might have been so" (BC Allen 1909)]। রিভার্স উপজাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন" "একটা সাধারণ ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী যার সদস্যরা একই ভাষায় কথা বলে এবং যুদ্ধের মতো সাধারণ বিষয়ে একই সাথে সক্রিয় হয়(রিভার্স, ১৯৭৭: ২৪২)" [(Tribe as a social group of a simple kind, the members of which speak a common dialect and act together in such common purposes as warfar (Rivers, 1977:242]

খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় "উপজাতি হচ্ছে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ যা অন্যান্য গোষ্ঠীর ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত"(আইয়ার এবং বলরাম, ১৯৬১: ২৪২) [(A tribe is a special group possessing a distinctive culture which marks it out from other groups having different cultures (Iyer and Balaratham, 1961: 242)]। লিনটন এর ভাষায়, "আদিবাসীর সরল প্রকৃতি হচ্ছে কতগুলো জোট এর সমষ্টি যারা অবিশ্রান্তভাবে কোন নিকটস্থ অঞ্চল বা অঞ্চল সমূহে বসবাস করে এবং একই সাথে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যতার সাথে একই সাংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে একই সাথে উদ্যোগী হওয়ার অনুভূতি ব্যাক্ত করে, রয়েছে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এবং একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী স্বার্থ।"(হাসনাইন, ১৯৮৩: ১৩) [(In the words of Ralph Linton" in its simplest form the tribe is a group of bonds occupying a contiguous terriory or territories and having a feeling of unity deriving from numerous similarities in culture, frequent contacts, and a certain numerous similarities in culture, frequent contacts, and a certain community of interest (in Hasnain, 1983: 13)]।

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার এবং মদন উপজাতির সংজ্ঞায়ন করেছেন এভাবে, "উপজাতি হচ্ছে আঞ্চলিকভাবে বসবাসের অধিকার প্রাপ্ত একটি সামাজিক গোষ্ঠী, যা অর্ন্তগোত্রীয় প্রকৃতির, যা বিশেষত্বহীন কার্যপ্রণালী সমৃদ্ধ, যা উপজাতির ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত, যা পরম্পরাগত বা অন্য রকমও হতে পারে, যা ভাষাগত এবং কথ্যভাবে ঐক্যবদ্ধ, যা অন্যান্য গোষ্ঠী বা বর্ণ থেকে স্বীকৃত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে, যা আতঙ্ক করার মতো সামাজিক অপযশমুক্ত, যেমনটা অনেকটা জাতিবর্ণ প্রথার কাঠামোর মতো যা প্রকৃতিকরণ ও সম্পূরক উৎস থেকে গৃহীত ধারণার ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা, সর্বোপরি যেখানে সবাই উপজাতীয় এবং আঞ্চলিক বা সীমানা কেন্দ্রিক অন্তর্নিহিত সংহতির সমস্বত্ত্বতার বিষয়ে সচেতন"(মজুমদার ও মদন, ১৯৭৭, ২৪১)। [(A tribe as a social group with territoria affilation, endogamas in nature, with no specialization of functions, ruled by tribal officers, hereditary or otherarise, untided in language or dialact, recognizing social distance with other tribes or castes, without any social oblioguy attaching to them, as it done in the caste structure, illberal of naturalzation, of ideas from alian sourecs above all conscious of homogenity of ethnic and territorial integral integration" (Majumdar and Madan, 1977: 241)]।

বেইলির মতে "যদি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর তাদের সম্পদের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তাদের অর্থনৈতিক উৎপাদন উদ্যোগ অন্যের নির্ভরশীল মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, এবং ঐ এলাকার অধিকাংশ অংশ জুড়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কীত ভাবে বাস করে, তাহলে তাদের উপজাতি বলা যেতে পারে"। (কাত্তাকায়ন, ১৯৮৩:৩০ [(Bailey (1960) stated that, if certain people have "direct" command over resources, and their access to the products of the economy is not derived medistely through a dependent states on others, and are a relatively large portion of the total population in the area, they can be termed a tribe (in Kattakayan, 1983:30)]।

পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চূড়ান্তভাবে বলতে পারি উপজাতির সংজ্ঞা দেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোন থেকে উপজাতির একটি সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা প্রদান করতে সক্ষম হন নাই।

এ প্রেক্ষিতে হাসনাইন উল্লেখ করেছেন যে, "উপজাতি ধারণাটি আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক বা সর্বজনীন অবস্থান থেকে ধারণা থেকে সরে আসাই শ্রেয়তর। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সার্বজনীন সংজ্ঞাটির ব্যবহারিকতা হয় খুব বেশী বিস্তৃত ও শিথিল অথবা খুব বেশী সংকীর্ন এবং সংরক্ষিত" (হাসনাইন, ১৯৮৩, ১৪)। [(It will be better to shy away from international or universal plane keeping in view the regional connotation of

Dhaka University Institutional Repository

the concept of tribe. This seems to be quite sensible in the situation when definations of universal applicability are either very broad and lose or very narrow and restricted" (Hasnain, 1983:14)]।

নৃবিজ্ঞানীগণ সূচনালগ্নে উপজাতির সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তারা বিভিন্ন ধারায় বিশ্বের বিভিন্ন উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন অষ্ট্রেলিয়ায়, মালয়েশিয়ায় এবং আফ্রিকায়। এই উপমহাদেশেও নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীগণ সুগভীরভাবে উপজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা এবং তাদের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং করছেন।

যাহোক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞানীগণ যেমন দুবে (Dube 1977), নাইক (Naik, 1960) এবং এহরেনফেলস (Ehernfels, 1955) প্রমুখ অনেক ক্ষেত্রেই "উপজাতি" সমাজের সংজ্ঞাটি এড়িয়ে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে এস্টলের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "অনেক ক্ষেত্রে এটা অস্পষ্টভাবে অনুমান করা হয় যে একটি উপজাতির কম-বেশী একটি সমজাতীয় সমাজ একটি সমজাতীয় সমাজ আছে যার একই সরকার, একই ভাষা এবং একই সংস্কৃতি আছে"(ইসলাম, ১৯৮১:৬)। [(A tribe has somewhat vaguely assumed to be a more or less homogenous society having a common government, a common dialact and a common culture(in Islam, 1981, 6)]।

রবার্ট রেডফিল্ড লোক সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "লোক সমাজ একটি ছোট সমাজ: এটা বিচ্ছিন্ন, অক্ষরজ্ঞানহীন, দলীয় সংহতির ভিত্তিতে সমজাতীয়, সরল শ্রমবিভাজন, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, ঐতিহ্যগত জীবনধারা, এটা একটা অন্তরঙ্গ সমাজ এবং এখানে ঐতিহ্যগত সমঝোতার সমন্বয় বিদ্যমান, অর্থাৎ সংস্কৃতি" (রেডফিল্ডস, ১৯৬২: ২৩১-২৪৭; ১৯৫২:২৫৬; এবং ১৯৪৭ ভলিয়ম ৪) [(The folk society is a small society: isolated, nonliterate, homogenity with a sense of group solidarity, simplicity of the technology, simple division of labour, economically independent of all others traditional way of life, it is familiar society and integration of conventional understanding i.e. culture" (Redfields, 1962:231-247; 1952: 256 and see also 1947. Vol. No. 4)]।

টেলর উপজাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "উপজাতি বলতে বুঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত এবং তাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককে অন্তর্ভূক্ত" (টেলর, ১৯৯১: ১৯১)।

Dhaka University Institutional Repository

যাদেরকে উপজাতি হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি ১৯৩১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে "আদিম উপজাতি" হিসাবে বর্ণনা করা হতো। ১৯৩১ সালের আদমশুমারীর সময়কালে তাদেরকে "উপজাতি" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে "উপজাতি" শব্দটিও সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে "আদিবাসী" শব্দটি সর্বোত্র সমাদৃত হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণাটিতে "আদিবাসী" বলতে আমরা এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝি যারা বৃহত্তর সমাজের বিভাজিত অংশ, বিচ্ছিন্ন, উচ্চমাত্রায় আত্মনির্ভরশীল, সমসত্ব, স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সম্বলিত, ঐতিহ্যগত এবং সরল প্রযুক্তিনির্ভর একটি গোষ্ঠী, যাদের শ্রমবিভাজন সরল এবং জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ও সমাজ কাঠামো বিদ্যমান।

বাংলাদেশের গারো আদিবাসীগোষ্ঠী ব্যবহারিক সংজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব করে। এই আদিবাসী গোষ্ঠী বৃহত্তর সমাজ এবং অন্যান্য আদিবাসীগোষ্ঠী থেকে পৃথক স্বকীয় পরিচয় বহন করে, তারা নৃতাত্ত্বিকভাবে স্বতন্ত্র, তাদের জীবনধারা নিজস্ব, আঞ্চলিকভাবে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে, অন্যান্যদের সাথে তাদের পেশাগত ও অর্থনৈতিক লেনদেন খুবই কম, এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ। তারা এখনও বিনিময় ভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। তাদের আছে নিজস্ব আইন-কানুন, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থা, এবং আরও আছে একজন গোষ্ঠী প্রধানের অধীনে নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভক্তি এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর গারো নৃগোষ্ঠী ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণগুলো হচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারীদের আগমন এবং খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ, জমিদারী প্রথার বিলোপ, বনাঞ্চল সমূহ সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা, জুমচাষ নিষিদ্ধকরন, পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে গারো অধ্যুষিত অঞ্চলে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়া সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগরায়ন, শিল্পায়ন, গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ পরোক্ষ কারণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে।

এই কারণগুলো গারোদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলতে প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে এবং তাদেরকে বহির্বিশ্বে আরেকটি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এই চাপগুলো গারোদের ঐতিহ্যকে বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় জীবনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে "উপজাতি" শব্দটিকে প্রত্যাখ্যান করে "আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো "Ethnic group" অথবা "Indigenous people"। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা এর সংজ্ঞা অনুযায়ী "আদিবাসী গোষ্ঠী হচ্ছে একটি সামাজিক গোষ্ঠী অথবা বৃহত্তর সমাজের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী। এরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটা অংশ হিসাবে নিজেদের মধ্যে একই নরগোষ্ঠী, জাতীয়তা এবং সংস্কৃতিতে আবদ্ধ। বহুমূখী আদিবাসীয় সমস্যার ফলে সৃষ্ট সামাজিক জটিলতা প্রায়শই সমকালীন সমাজে দেখা যায়। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, উত্তরাধিকারীভাবে শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন পন্থায় সাধারণ গোষ্ঠীর উপর শাসন কায়েম করে। এর ক্রমধারায় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একটি প্রাধান্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীর অধীনে থাকতে দেখা যায়। এসব গোষ্ঠী উক্ত গোষ্ঠীর অধীনে থাকে যারা প্রধানত নিজ স্বার্থে এসব লোকদের এনে থাকে তাদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে এবং এর উদ্দেশ্যে বা প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক সফলতার জন্য। আবার এসব জনগোষ্ঠী শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক কারণ এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অধীনস্থ হওয়ার জন্য। অভিচরনের চিরাচরিত প্রথা থেকে সরে আসছে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে গিয়েও এদের অনেককে তাদের আবাসভূমি ছাড়তে হয়েছে"(এনসাইক্লপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, সাফ্রা সম্পাদিত, ২০০২: ভল-৪, ৫৮২)। ["(Ethnic group is a social group or catagory of the population that in a larger society; is set apart and bound together by common ties of race, language, nationality, or culture. Ethnic diversity is one form of social complexity found in most contemporary societies. Historically it is the legacy of conquests that brought diverse peoples under the rule of a dominant group; of rules who in their own interests imported peoples for their labour or their technical and business skills; of industrialization which intensified the age-old pattern of migration for economic reasons, or of political and religious persecutions that drove people from their natievelands" (Encyclopedia of Britannica, Edit- E. Safra, 2002: V-4, 582)]।

অক্সফোর্ড ডিকশনারীর সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসী গোষ্ঠী হচ্ছে "যারা জন্মগতভাবে বা পারিবারিক ইতিহাসের ভিত্তিতে একটি অঞ্চল বা দেশের অধিকারী হয়, জাতীয়তার ভিত্তিতে নয়" (অক্সফোর্ড এডভান্স লার্নার ডিকশনারী, ৩৯৩)। [(Belonging to the specified country or area by birth or family history rather than by nationality" (Oxford Advanced Learner Dictionary, Edit-Crowther, Year: 393)]।

১.৭.১। সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের সমগ্র জীবন ধারায় পরিবর্তন আসে। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দ্বিবিধ। যথা-

১। আভ্যন্তরীন ও

২। বাহ্যিক

Dhaka University Institutional Repository

সকল সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মাত্রা সমাজ ভেদে ভিন্ন। আধুনিক উন্নত সমাজের চেয়ে আদিম এবং গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের গতি অধিকতর মন্থর। পরিবর্তনের শক্তি সমূহের ওপর এর গতি নির্ভরশীল। সমকালীন নৃবিজ্ঞানীরা আদিম সমাজে মানুষের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, কলাকৌশল, এবং জীবনধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। পুরাতত্ত্ববিদরাও প্রাগৈতিহাসিক সমাজে পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার প্রমাণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

সামাজিক পরিবর্তনের মতবাদ দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে যুক্ত। পাশ্চাত্যের গ্রীক দার্শনিক থেলিস (Thales, আনুমানিক ৬২৪-৫৫০ খৃঃ পূঃ) পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করেন। তাঁর সে চিন্তাধারা বস্তুবাদী (materialistic) চিন্তার গোড়াপত্তন করে।

হিরোক্লীটাস (৫৩৫-৫৭৫ খৃঃ পূঃ) বলেন "বিশ্ব ব্রহ্মান্ড কেবলমাত্র কতক জড় পদার্থের সমষ্টি নয়- বরং কতক ঘটনা, পরিবর্তন ও তথ্যের সমষ্টি" (লফাস, ১৯৮৯: ২০৮)। তাঁর এই ধারণাই আধুনিক যুগের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলসূত্র। হিরোক্লীটাস বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সাথে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কেও চিন্তা করেছেন। তিনি যে পরিবর্তনশীল জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার রহস্য উদঘাটনে ব্যপৃত হলেন পার্মানিডিস, ডিমোক্রিটাস, প্লেটো ও এরিষ্টটল। বিশেষ করে প্লেটো ও এরিষ্টটল গ্রীক দর্শনের এ দুই দিকপাল থেকে দর্শন শাস্ত্রের দু'টি ধারা বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে; এর মধ্যে একটি হলো "Idealist" বা ভাববাদী এবং অপরটি "Meltrialist" বা "বস্তুবাদী"।

সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিদগ্ধমন্ডলীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম সামাজিক দার্শনিক ইবনে খালদুনের নাম এক্ষেত্রে স্মরনীয়। তিনি মানব ইতিহাসের ধারাকে স্বাভাবিক বিবর্তনশীল (natural evolutionary) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ বিকাশের পথ সুগম করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁকে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদের জনক বলা যায়।

আধুনিক যুগের শুরু থেকে চিন্তাবিদগণ নিরবচ্ছিন্ন প্রগতির কথা বিশেষভাবে ভাবতে থাকে। একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব– এসময়ে এরকম একটি ধারণার বিকাশ হয়। এর ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাসী এবং নিজেকে ভাগ্য নিয়ন্তা মনে করতে থাকে। এ সময় বুদ্ধিজীবি মহলে সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আশাবাদী ধারণার বিকাশ হয়।

সপ্তদশ শতকে দার্শনিক বেকন সামাজিক পরিবর্তন ও নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিকে একার্থবোধক দাবী করেন। বিশেষ করে ফরাসী চিন্তাবিদ তুর্গোও কঁদরসেরে অষ্টাদশ শতকে এ মতবাদটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। কঁদরসের এর মতে মানব সমাজ ক্রম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। মাঝে

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে প্রগতি ব্যাহত হলেও সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মানব সমাজ ক্রমেই উচ্চতর স্তরে উপনীত হচ্ছে। কঁদরসেরে এর মতে মানবিক উন্নতির কোন সীমারেখা নেই। অনন্তকাল ধরে মানুষের উন্নতি চলতে থাকবে। সমাজবিজ্ঞানের অগ্রদূতরা স্বীকার করেছেন যে, সমাজ বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়েছে। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ত কোঁৎ এরকম তিনটি স্তরের কথা বলেছেন; যথা- ১। ধর্মকেন্দ্রিক (theological), ২। তত্ত্ব-দার্শনিক (methaphysical) এবং ৩। দৃষ্টবাদী (positive)। প্রথম স্তরে মানুষ বিশ্বাস করতো যে, অতিপ্রাকৃত (supernatural) শক্তি দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এ স্তরে মানুষের বস্তুভক্তি (fetishism) ছিল। কালক্রমে তাদের একেশ্বরবাদে (monotheism) বিশ্বাস জন্মে। আধুনিক কাল আসার পূর্ব পর্যন্ত মানবচিন্তা এই স্তরে ছিল। এরপর আসে তত্ত্বগত দার্শনিক চিন্তার (metaphysical) যুগ। একে অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়। সব ঘটনাকে অমূর্ত দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে বিবেচনা করা এ স্তরের বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক চিন্তার মাধ্যমে আধুনিক কালে মানুষ দৃষ্টবাদী (positive) স্তরে উপনীত হয়েছে। এ স্তরে মানুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (empirically) মাধ্যমে সকল ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়। মানবচিন্তার এই ক্রমবিবর্তনকে কোঁৎ প্রগতি (progress) বলেছেন। মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর সামাজিক অগ্রগতি নির্ভরশীল।

বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার জীবদেহের সংগে সমাজ দেহের সাদৃশ কল্পনা করেছেন। তিনি প্রগতিকে বিবর্তন বলে গণ্য করেছেন। স্পেনসার বলেন আদিম সমাজে মানুষ কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল। এই সমাজকে তিনি সমরবাদী (militaristic) সমাজ বলে চিত্রিত করেছেন। কালক্রমে মানব সমাজে শিল্পের বিকাশের ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেনসার একে শিল্প প্রধান (industrial) সমাজ বলেছেন। তিনি মনে করেন আদিপূর্বে সামাজিক পার্থক্য কম ছিল। কালক্রমে সামাজিক পার্থক্য বাড়তে থাকে। শিল্প সমাজে বিভিন্ন অংশের ভেতর সমঝোতা ও সংহতি গড়ে উঠে। সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণী এবং বর্ণগোষ্ঠীর মানুষ পরস্পর শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হয়। সকল শ্রেণী কমবেশি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার লাভ করে। স্পেনসারের সামাজিক বিবর্তন মূলত একটি স্বয়ংক্রিয় সামাজিক প্রক্রিয়া।

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্যদের মতো রুশ সমাজবিজ্ঞানী মিখাইলভস্কী এবং সলোভীভ, অগাষ্ট কোঁৎ এর ভাবধারা অনুসারে সামাজিক পরিবর্তনের একটি নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন তাদের মিখাইলভস্কীর মতে মানব সমাজ তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে। যথা-

১। বাস্তব ধর্মী মানব কেন্দ্রিকতা (objective anthopocentric);

২। কল্পনা- বিলাসিতা (eccentric); ও

৩। আত্মমুখীন মানব কেন্দ্রিকতা (subjective anthropocentric)।

Dhaka University Institutional Repository

তার মতে প্রথম স্তরে মানুষ নিজেকে বিশ্ব সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মনে করেছে। তখন সে অতিপ্রাকৃত ধারণা ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ছিল। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ বাস্তবতার পরিবর্তে বিমূর্ত চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছে। তত্ত্বগত দার্শনিক কল্পনাবিলাশ এ স্তরের বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তরে মানুষ নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। সমাজ কল্যাণ ও মানবতাবাদের আদর্শ এ যুগের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে সলোভীও তিনটি স্তরে সমাজ বিকাশের ধারাকে ভাগ করেছেন। যথা-

১। আদিম (tribal);

২। জাতীয় রাষ্ট্র বা সরকার (national governmental); ও

৩। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ (universal brotherhood)।

সমাজ সব সময় ধাপে ধাপে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পদার্পণ করছে এবং সর্বক্ষেত্রেই একইভাবে প্রগতি হচ্ছে- এ মতবাদটি বর্তমানে অনেকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। কারণ এ মতবাদটি অনেকটাই কল্পনা প্রসূত, তথ্যনির্ভর নয়।

১.৭.২। সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেমূলক তত্ত্বসমূহ

অনেক সমাজবিজ্ঞানীই সামাজিক প্রগতিকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মনে করেছেন, এবং তাঁদের মতে মানুষের সজ্ঞান ও সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টায় এটা অর্জন করা যায়। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ওয়ার্ডের মতে প্রগতির অর্থ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দের পরিমাণ বাড়ানো। সজ্ঞান পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক প্রগতি সম্ভব। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, মানুষের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে। সে জন্য মানুষের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ অপরিহার্য। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তা, যুক্তিশীল এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে। ওয়ার্ডের মতে স্বাভাবিক বিবর্তন অনিশ্চিত এবং এর ফলে বেশী অপচয় হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রনোদিত (social telesis), এবং বুদ্ধিনির্ভর পরিকল্পনা (intelligent planning) সামাজিক পরিবর্তনের গতি বাড়িয়ে দেয় এবং সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সমাজবিজ্ঞানী এলউড ও আরো অনেকে সামাজিক উন্নতি বা বিকাশ সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ করলেও ওয়ার্ডের মতো এতটা চরমপন্থী নয়। এলউড মনে করেন প্রাথমিক ও নিম্নতর স্ত রে সামাজিক বিকাশ মানুষের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হতো। কিন্তু পরবর্তী স্তরের সামাজিক বিকাশ মানুষের যুক্তিশীলতা ও উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নতি অধিকতর নিশ্চিত করা যায়।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক স্টাইন বলেছেন যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বিকাশের ওপর সামাজিক প্রগতি নির্ভরশীল। তিনি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং কার্যকারিতা সুষ্ঠু সমাজবিজ্ঞানসম্মত ধারণার ওপর নির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

করে। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভবিষ্যতে জাতীয়তাবাদের বিলোপ সাধন ঘটবে এবং ছোটবড় সকল রাষ্ট্র মিলে একটি রাষ্ট্রসংঘ (federation of states) গড়ে উঠবে। এর ফলে মানুষে মানুষে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সহযোগিতার সুযোগ বাড়বে এবং রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পরিবর্তে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ন হবে।

বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী হবহাউজ মনে করেন মানসিক শক্তি দিয়ে পার্থিব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক উন্নতি সম্ভব। একমাত্র বুদ্ধি ও শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক উন্নতি সম্ভব এবং একমাত্র বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই সামাজিক উন্নতি সুনিশ্চিত হতে পারে। অতএব, মানুষের যুক্তিশীলতার ক্ষমতাকে বাড়াতে হবে যাতে সামাজিক বিবর্তনে অধিকতর কাজে লাগান যায়। ওয়ার্ড, এলউড ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণাকে যুক্তিশীল (rationalistic) বা উদ্দেশ্যমূলক (purposive) বলা যায়। তাঁদের এ ধারণাটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কারণ সাধারণ মেধা সম্পন্ন মানুষের চিন্তাধারার সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

১.৭.৩। সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রনমূলক তত্ত্ব

সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণমূলক মতবাদটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এতে বলা হয়েছে সামাজিক কিংবা প্রাকৃতিক কারণে সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের চিন্তা ও উদ্দেশ্যের সাথে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কোন কারণ নেই। উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা তখনই কার্যকরী হতে পারে যখন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ ও পরিস্থিতি সহায়ক হয়। সামাজিক পরিবর্তনের চূড়ান্ত শক্তিসমূহ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের ভেতর মতপার্থক্য থাকলেও সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবাই একমত বলে মনে করা হয়।

১.৭.৪। স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনের তত্ত্ব

সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলার সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণমূলক বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে অর্থনৈতিক কারণে সমাজে স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন হয়ে থাকে। কেলার সামনারের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃস্ফুর্ত পরিবর্তনসূচক (automatic changes) মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মতবাদটি কেলার এর "social evolution" নামক বই-এ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে যে পরিবর্তন মানুষের যুক্তি ও সজ্ঞান প্রচেষ্টা প্রসূত নয় সেটাই স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃস্ফুর্ত পরিবর্তন বলে গণ্য। প্রয়োজনবোধে লোকরীতির (folkways) পরিবর্তন করে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু লোকরীতি পরিবর্তের মাধ্যমে আনিত সামাজিক পরিবর্তন সুপরিকল্পিত নয়। তবে এটা ঠিক যে লোকরীতির পরিবর্তন প্রথমে সমাজের কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বস্তুত মানুষের উগ্র বাসনাই লোকরীতির পরিবর্তনে তাদের প্রলুব্ধ করে। কিন্তু কোন কোন রীতি তারা গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে সমাজের স্বতঃস্ফুর্ত চাহিদার ওপর। কেলার মনে করেন

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সজ্ঞান প্রচেষ্টা ও যুক্তিসিদ্ধ পরিকল্পনা সামাজিক পরিবর্তনে কার্যকরী হতে পারে যদি সমাজের লোকরীতি এই পরিবর্তনের সহায়ক হয়। মানুষ শুধু পরিবর্তনের গতিকে বাধা দিতে কিংবা দ্রুততর করতে পারে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন প্রাচীন গ্রীসের পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে যখন দাসত্ব প্রথা বেমানান হয়ে পড়ে তখনই দাসদের সংগ্রাম সাফল্যলাভ করে। অর্থাৎ দাসত্ব প্রথা সংক্রান্ত লোকরীতি অচল না হলে শুধু সংগ্রামের মাধ্যমে এর বিলোপ সাধন সম্ভব নয়। তারা মনে করেন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নয়, সামাজিক পরিবর্তন লোকরীতি পরিবর্তনের অনুসারী মাত্র। কেলার আরও বলেছেন উৎপাদন যন্ত্রের প্রচলিত কলাকৌশলের প্রতি সমাজের অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অসন্তুষ্টি থেকে সামাজিক পরিবর্তন আসে। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন লোকেরা উৎপাদনের এমন সব নতুন কলাকৌশলের বিকাশ ঘটায় যেসব দিয়ে আগের চেয়ে অধিকতর ভালভাবে উৎপাদন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব। এভাবে সৃষ্টিশীল লোকেরা নতুন লোকরীতিকে তাদের জীবন ধারার সাথে সংযুক্ত করে। ফলে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের পার্থিব জীবনেই সর্বপ্রথম পরিবর্তনের ধাক্কা আসে। তাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের যে জোয়ার আসে সেটাই সমাজের অন্যান্য দিককে প্রভাবিত করে।

১.৭.৫। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের তত্ত্ব

জার্মান মনিষী কার্লমার্কস অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেন। সমাজের সবকিছু অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে এ ধারণা মার্কস ছাড়াও অনেকের চিন্তাধারায় লক্ষ্য করা যায়। তবে মার্কসই বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমান করেছেন যে, সমগ্র সমাজ কাঠামো অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা ইতিহাসে বস্তুবাদী (Materialistic Interpretation of History) নামে পরিচিত। মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের মতে মানব সমাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে এবং প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্ব সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পূর্ববর্তী স্তরের আভ্যন্তরীন বিরোধের ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তী স্তরের বিকাশ হয়। প্রধানত উৎপাদনব্যবস্থা এবং সম্পদের বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তিত হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্র, ধর্ম এবং পরিবার প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর ঘটে। তাই সামাজিক পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ মূখ্য। সমাজের অন্যান্য সব দিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল এবং অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কার্ল মার্কসের মতে সমাজ বিকাশের প্রধানত চারটি সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে এবং প্রত্যেক ধারাই নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। তাঁর মতানুসারে পঞ্চম স্তরটি চূড়ান্ত ও আদর্শ। এই স্তরটি এখনও প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে। তবে এর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ অনুসারে সমাজবিকাশের পাঁচটি ধারা হলো-

১। প্রাচ্য বা এশীয় সমাজ ব্যবস্থা (Oriental or Asiatic);
২। প্রাচীন সমাজব্যবস্থা (Ancient);
৩। সামন্তবাদী (Feudal);
৪। ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী (Capitalistic); ও
৫। সাম্যবাদী (Communistic)।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসের মতে এশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবচেয়ে আদিম। অনগ্রসর সমাজে এ ধরনের অর্থনীতি দেখা যায়। এই অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো (১) ভোগের জন্য উৎপাদন, (২) পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ শ্রম বিভাগ, এবং (৩) সম্পত্তির যৌথ মালিকানা। পশু সম্পদ ও বিলাস দ্রব্যের ব্যক্তিমালিকানা এবং ব্যবসা ও জিনিসপত্রের বিনিময়- ব্যবস্থার বিকাশের ফলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সমাজে উৎপাদন শুধু ভোগের জন্য নয়, বিনিময়ের জন্যেও। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উত্থান ঘটে। ধনসম্পদ অর্জন করে এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষমতাশীল বণিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। জমি-জমার ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত হয়। দাসত্ব প্রথার সূত্রপাত ঘটে। চাষীদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং দাস ব্যবসা অলাভজনক হয় তখন সামন্তবাদের সূচনা হয়। এই স্তরে জমি-জমার প্রধান মালিক হয় অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা। কৃষক উৎপাদনযন্ত্রে সামান্য অধিকার লাভ করে। কারিগর শ্রেণী উৎপাদনের হাতিয়ার এবং উৎপাদিত জিনিসপত্রের মালিক হয়। সামন্তবাদে প্রধানত ভোগের জন্যই উৎপাদন হয়। মুদ্রা অর্থনীতি, মজুরিবৃত্তি, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতির ফলে ক্রমশঃ সামন্তবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বনীক শ্রেণী উৎপাদনযন্ত্রের নিরংকুশ অধিকার ও মালিকানা লাভ করে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর একমাত্র সহায় তার শ্রম। শ্রমিক শ্রেণী সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ বুর্জোয়া এবং সর্বহারা এই দুই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মার্কসের মতে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এর আভ্যন্তরীন সংঘাত ও স্ববিরোধীতার জন্য ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধনতন্ত্রবাদের পর যে সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে সেটা পর পর দু'টি স্তর পার হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রথম স্তরে সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন পুঁজিবাদী শাসন ও সমাজব্যবস্থার অবশেষসমূহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় স্তরে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন রাষ্ট্র লোপ পাবে, সমাজ শ্রেণীহীন হবে, শ্রেণী সংঘাত ও শোষণ থাকবে না। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব দক্ষতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন মতো সবকিছু পাবে। মার্কস এমন একটি সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা বিবর্তিত হয়ে পঞ্চম স্তরে এসে পূর্ণতা লাভ করবে।

মানব সমাজ সম্পর্কে মার্কসের সিদ্ধান্ত সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। অনেকের মতে তাঁর সিদ্ধান্তের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে তাঁর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদকে (Economic Determinism) অনেক সমাজবিজ্ঞানী নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অনেকের মতে একমাত্র অর্থনৈতিক শক্তিই সমাজ বিবর্তনে শক্তি যোগায় এটা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। তবে মার্কস নিজেও অন্যান্য শক্তির প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। সমাজ ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আদর্শ সমাজব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

দিকে এগিয়ে চলছে- মার্কসের এ মতবাদটি সমাজবিজ্ঞানীরা খন্ডন করেছেন। এদিক থেকে মার্কসের মতবাদ অন্যান্য বিবর্তনমূলক মতবাদের মতোই সমালোচনা যোগ্য। এরপরও বলা যায় আধুনিক সামাজিক মতবাদ গুলোর মধ্যে মার্কসের মতবাদই সমকালীন সমাজ ও মানুষের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে।

১.৭.৬ সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রতা সংক্রান্ত অনুমান

সমাজবিজ্ঞানী ওগবার্ণ তাঁর "Social Change" নামক গ্রন্থে সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রতা সংক্রান্ত মূল্যবান প্রতিপাদ্যটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী সামনার, ওয়ালাস, স্পেনসার প্রমুখ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু একমাত্র সমাজবিজ্ঞানী ওগবার্নই এটাকে একটি সুনির্দিষ্ট মতবাদের রূপ দেন। ওগর্বান এর মতে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ সমানভাবে পরিবর্তিত হয় না। ফলে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের ভেতর ব্যবধান দেখা দেয়। এজন্য সকল অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়। সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রতার সীমা ও সময় সবসময় একরকম নয়। এটা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং তখন অনিবার্যভাবে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেয়। ওগবার্ন মনে করেন পরিবর্তন প্রথম পার্থিব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সূচিত হয়। তাই সংস্কৃতির অপার্থিব দিকটিকে এর সাথে সামঞ্জস্য করে চলতে হয়। তা না হলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব। কোন কোন সময় সংস্কৃতির অপার্থিব উপাদানেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অপার্থিব সংস্কৃতির পরিবর্তন পার্থিব সংস্কৃতির পরিবর্তনের মতো এতটা দ্রুত নয়। অর্থাৎ আধুনিক মানুষ কিভাবে তার চিন্তাধারা ও আচার-আচরণকে দ্রুত পরিবর্তনশীল যান্ত্রিক কলাকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করবে সেটাই আধুনিক কালের সমস্যা। ওগবার্ণ তার মতবাদের সমর্থনে অনেক উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন। যেমন- কৃষি সমাজের উপযোগী পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আজও অনেক শিল্প শহরের সমাজে টিকে আছে।

অন্যান্য সব মতবাদের মত ওগবার্ণ এর মতবাদটিও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, তবুও বলা যায় এই সাংস্কৃতিক দীর্ঘসূত্রীতার মতবাদটি সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

১.৭.৭। আদর্শবাদী নিয়ন্ত্রণবাদ

বেশ কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ অর্থনৈতিক বা বস্তুতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধীতা করে বলেছেন যে, সংস্কৃতির অপার্থিব উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ। রুশ সমাজবিজ্ঞানী রবার্টির মতে ভাব বা অর্দের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন মানুষের চিন্তা ও ধারণা সঞ্জাত, কর্ম এবং পার্থিব উপাদান প্রসূত নয়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী টার্ডও একইরকম ধারণা করেছেন। আদর্শবাদী নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থকদের মধ্যে লীবোঁ, সরেল, ফ্রেজার এবং অ্যালউড অন্যতম। তাঁরা ধর্মকে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এ মতবাদকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মতে ধর্মই সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। যার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ওয়েবার প্রমান করার চেষ্টা করেছেন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, প্রাচীণ চৈনিক ধর্ম এবং ইহুদীদের ধর্ম মত তাদের অনুসারীদের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। তবে ওয়েবার সমাজ পরিবর্তনে অন্যান্য শক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি।

ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণবাদ সব সমাজবিজ্ঞানী সমর্থন করেন নাই। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন এ প্রসঙ্গে তার "Contemporary Socialogical Theories" গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তার মতে, সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই কোন একটি কারণ প্রাথমিক বা মূখ্য বলা যায় না (কোনিগ, অনুবাদঃ রঙ্গলাল সেন, ১৯৯৪: ৩০৪)। সরোকিনের এ মতবাদটি অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

১.৭.৮। সামাজিক পরিবর্তনের চক্রাকার আবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ

"সমাজ ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকার ভাবে আবর্তন করে" এটি একটি প্রাচীন ধারণা যা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে (History repeats itself)- এই ধারণাটির সমগোত্রীয়। বর্তমান কালেও এই প্রাচীন ধারণাটি বিভিন্নভাবে টিকে আছে। এখানে চক্রাকার আবর্তন সংক্রান্ত কতিপয় তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১.৭.৮.১। জৈবিক আবর্তন মতবাদ

বিখ্যাত ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানী ল্যাপোগ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সামাজিক পরিবর্তন চক্রাকারে সম্পন্ন হচ্ছে। তার মতে বর্ণই (race) সংস্কৃতির প্রধান নিয়ন্তা। নরডিক জাতির লোকেরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এজন্য তারা একটি উন্নত সভ্যতার বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজে যখন শ্রেষ্ঠ বর্ণের ব্যক্তিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতি হয়। আর যখন নিকৃষ্ট বর্ণের লোকের সংমিশ্রন ঘটে তখন সমাজের অবনতি শুরু হয়। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক নির্বাচনের ফলে অনেক শক্তিশালী ও উন্নত সভ্যতা ভেঙ্গে পড়ছে। বিদেশী বংশোদ্ভুত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ফলে আর্যরক্ত বংশোদ্ভুত পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। জার্মান নৃবিজ্ঞানী অটো এবং আরও অনেকে এই মতবাদকে সমর্থন করলেও আধুনিক কালে এই বর্ণবাদী (racialist) মতবাদের কোন ভিত্তি পাওয়া কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭.৯। সাংস্কৃতিক আবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ

সমাজবিজ্ঞানী স্পেংগলার তার "Decline of the West" নামক গ্রন্থে সামাজিক আবর্তন সূচক (cyclical) আরেকটি মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, সকল মানব সভ্যতাই বিবর্তিত হচ্ছে। সকল সভ্যতারই জন্ম, পরিণতি ও মৃত্যুদশা রয়েছে। বিকাশ ও অবক্ষয়ের ধারা সকল সমাজ ও সভ্যতায় সুস্পষ্ট। বিভিন্ন কারণে সভ্যতার আবর্তন ঘটে থাকে। তার মতে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে। এর ভাঙ্গন অনিবার্য। সকল অবলুপ্ত সভ্যতার মতোই এর অবক্ষয়ের পালা এখন শুরু হয়েছে।

ইটালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভেলফ্রেডো পেরেটো মনে করেন রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রত্যেক সমাজই চক্রাকারে আবর্তন করে। এক সময় সমাজের রাষ্ট্রশক্তি খুবই শক্তিশালী থাকে, আবার অন্য সময় এটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে চক্রাকারে রাষ্ট্রশক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে। পেরেটো বলেছেন প্রত্যেক সমাজ প্রধানত দুই ভাবে বিভক্ত; যথা-

(১) হীন রক্ষণশীল (pentiers)- এরা চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রাখতে চায় এবং

(২) শক্তিশালী বা ভাগ্যন্বেষী (speculators)- এরা মধ্যস্বত্বভোগী, যে কোন ভাবে নিজের স্বার্থ আদায়ে বদ্ধপরিকর।

শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সমাজে ভদ্র (elite) এবং ভাগ্যান্বেষী (speculic)। এই অভিজাত, ভদ্র ও ভাগ্যান্বেষী দল যখন বল প্রয়োগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে বা একে বজায় রাখে তখন রাষ্ট্রশক্তি মজবুত থাকে। কিন্তু সবসময় এরা ক্ষমতায় টিকতে পারে না। বিভিন্ন কারণে নেতৃত্ব যখন দুর্বল হয় তখন এদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। এই সময়ে নিম্ন শ্রেণী সমাজে উদ্যোগী, উৎসাহী ও ভাগ্যান্বেষী লোকের আবির্ভাব ঘটে। যারা একদিন পদানত ছিল তারা শক্তি সঞ্চয় করে নতুন অভিজাত শাসক শ্রেণীর চক্রাকার আবর্তন (circulation of elites) ঘটায়। রাজনৈতিক আবর্তনের মতো অর্থনীতি ও আদর্শেরও চক্রাকার আবর্তন ঘটে। আদর্শের ক্ষেত্রে প্রথম আস্থা ও বিশ্বাস- প্রবনতার যুগ এবং পরে সংশয় ও সমালোচনার যুগের সূত্রপাত হয়। পরিশেষে আবার বিশ্বাসের পালা আসে। এভাবে আদর্শের ক্ষেত্রে চক্রাকার আবর্তন চলতে তাকে।

সমাজবিজ্ঞানী চ্যাপিন তার "Cultural Change" নামক গ্রন্থে চক্রাকার আবর্তনের আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার প্রতিপাদ্য বিষয় হল সমাজের চক্রাকার আবর্তন হলো যুগপৎ পরিবর্তন (synchronous cyclical change)। তার মতবাদ অনুসারে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ অথবা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান একই ভাবে পরিবর্তিত হয়। সবকিছুরই বিকাশকাল, যৌবন এবং অবক্ষয়ের ধারা আছে। চ্যাপিলন পরিবার ও রাষ্ট্রকে প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেছেন। তার মতে যদি সমাজের ও রাষ্ট্রের আবর্তন একই সময়ে নিষ্পন্ন হয় তাহলে সমগ্র সংস্কৃতির সংহতি

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পায়। আর যদি এ দু'টোর আবর্তন যুগপৎ নিষ্পন্ন না হয় তাহলে সমগ্র সংস্কৃতিরই ভগ্নদশা সূচিত হয়। সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ যদি সময়মতো যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করে তাহলে সমগ্র উন্নতির শিখরে আরোহন করে। অপরদিকে, সংস্কৃতির অধপতনও ঘটে। জীবজগতে যেমন জীবের বিকাশ ও মৃত্যুদশা দেখা যায় তেমনি সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিকাশ ও ভগ্নদশা পরিলক্ষিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন সামাজিক পরিবর্তনের পুনরাবর্তনমূলক (recurrent cycle) একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। তার মতে সমাজের চক্রাকার আবর্তন একই সূত্র ধরে নিষ্পন্ন হয়। সভ্যতা কোন কোন নির্দিষ্ট সূত্র ধরে কিছুদিন বিকাশ লাভ করতে থাকে; কিন্তু কোন কারণে মধ্যপথে সমাজের গতিধারার পরিবর্তন ঘটতে পারে যার ফলে সমাজ নতুন পথ গ্রহণ করে। এই নতুন পথও বেশী দিন স্থায়ী থাকে না। এই পথেও বাধা এসে সমাজকে অন্যধারায় প্রবাহিত করে। এভাবে সীমাহীন টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা নিজের গতিধারার পরিবর্তন করে পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং এর চক্রাকার আবর্তনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সরোকিন তাঁর মতবাদ অনুসারে একে পরিবর্তনশীল ঘটনার পুনরাবৃত্তি (variable recurrence) বলেছেন।

বিশ্ব সভ্যতার চক্রাকার আবর্তন সম্পর্কে বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক টয়েনবিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। টয়েনবির মতে সভ্যতার যৌবনাবস্থা (youth), পূর্ণতা প্রাপ্তি (maturit) এবং ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা (decline) আছে। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হলো চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা; দ্বিতীয়টি হলো চ্যালেঞ্জের সংকট কাল; এবং তৃতীয় স্তরে ক্রমশঃ ভগ্নদশা শুরু হয়। এভাবে সভ্যতার চূড়ান্ত পতন ঘটে। বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রমানের সাহায্যে টয়েনবিও সরোকিন এবং স্পেংগলারের মতো তার বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত চক্রাকার আবর্তনমূলক মতবাদটি দার্শনিক চিন্তার ফলশ্রুতি, বিজ্ঞানসম্মত এবং সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার ফলাফল নয়। ইতিহাস- দর্শনের (philosophy of history) পুন:বিকাশের ফলে এবং সামাজিক পরিবর্তনের একমাত্রিক মতবাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে চক্রাকার আবর্তন সংক্রান্ত সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

যা হোক, গারো সমাজের পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলার এর স্বতঃস্ফুর্ত পরিবর্তনসূচক মতবাদটিকে বেশী উপযোগী মনে করা হয়েছে।

কেলার তাঁর "স্বতঃস্ফুর্ত পরিবর্তনসূচক" মতবাদটি "Social Evolution" নামক বই-এ বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যে পরিবর্তন মানুষের যুক্তি ও সজ্ঞান প্রচেষ্টা প্রসূত নয়, তাই স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃস্ফুর্ত পরিবর্তন গারো সমাজের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করছি। কারণ হিসেবে বলা যায় গারো সমাজের সংরক্ষিত কোন লিখিত

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস নেই। তাদের এই মৌখিক ইতিহাস সময়ের সাথে সাথে অবশ্যই কিছুটা পরিবর্তনের স্বীকার হবে যা তাদের ইচ্ছাকৃত এবং সজ্ঞান প্রচেষ্টায় নয়।

সামনার এবং কেলার আরও বলেছেন প্রয়োজনবোধে লোকরীতির পরিবর্তন সাধন করে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। কিন্তু লোকরীতির পরিবর্তনজনিত সমাজের এরকম পরিবর্তন সুপরিকল্পিত নয়। তারা আরও বলেছেন যে, লোকরীতির পরিবর্তনে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি প্রথমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ মানুষের উগ্র বাসনাই লোকরীতির পরিবর্তনে তাদের প্রলুব্ধ করে। কিন্তু কোন কোন লোকরীতি তারা গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার ওপর।

গারো সমাজের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় গারোরা তাদের ঐতিহ্যবাহী লোকরীতির পরিবর্তনে সবসময়ই সচেষ্ট। তাদের সংস্কৃতিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা তাদের ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে আধুনিকতার স্পর্শ পেতে বেশী আগ্রহী। খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ এবং বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে এসে তাদের ঐতিহ্যবাহী লোকরীতির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। এই পরিবর্তনে উচ্চশিক্ষিত এবং উদার ও আধুনিক মনস্ক ব্যক্তিবর্গই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। গারো জনগোষ্ঠীর উগ্র বাসনা তাদের লোকরীতির পরিবর্তনে প্রলুব্ধ করছে। বিশেষভাবে বলা যায় তাঁদের ঐতিহ্যবাহী সাংসা ধর্মকে পরিহার করে খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণের সাথে সাথে প্রাপ্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ গারোদের আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রতি প্রলুব্ধ করেছে। বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে গারো নৃগোষ্ঠী আধুনিক লোকরীতি গ্রহণ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। গারো নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী লোকরীতিকে পরিহার করে নতুন লোকরীতি গ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। এই লোকরীতির পরিবর্তন তাদের সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া অন্যান্য কারণসমূহ গারো সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে যায় প্রভাবকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করে বাংলাদেশে গারো নৃগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলার এর স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন তত্ত্বটি বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়েছে।

সামনার এবং কেলার এর তত্ত্বটি অনেক বেশী সনাতন, যদিও বর্তমান গারো সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বর্তমান কালের আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বগুলোর সাথে বর্তমান গারো সমাজের পরিবর্তন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়ার কোন সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় নাই। এই গবেষণায় দেখা গেছে গারো সমাজ বৃহত্তর সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন নীতিমালা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গারো সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বগুলোকে পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় এই তত্ত্বগুলো মূলত গঠিত হয়েছে ইউরোপীয় সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে, আলোকময়তার যুগ, শিল্পবিকাশ, ফরাসী বিপ্লব এবং উপনিবেশবাদ এর প্রেক্ষাপটে যা গারো সমাজ পরিবর্তনের

Dhaka University Institutional Repository

গতিধারা প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে গারো সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর নিজস্বতার আলোকে।

১.৮। গারো সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীদের পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন এবং উপাদানমূলক গবেষণার সংখ্যা যথেষ্ট স্বল্প। গারো সম্পর্কিত পূর্বোক্ত গবেষণা এখানে সন্নিবেশিত হলো। গারো নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত গবেষণা সমূহকে আমরা মূলত: নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত: ঐতিহাসিক

নৃগোষ্ঠী বিষয়ক প্রথমদিকের সব লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল বৃটিশ শাসনামলে। এগুলো প্রধানত রচিত হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসক, বিশেষজ্ঞ এবং মিশনারীর দ্বারা যারা সেই সময়ে এ অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন এবং অস্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন। এইসব গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে সহায়তা করা, খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা এবং কিছু স্মৃতিচারন। প্রাথমিকভাবে গারো নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক ধারণা যে সব লেখা থেকে পাওয়া যায় তা মূলতঃ রচিত হয়েছিল বৃটিশ প্রশাসক, মিশনারী এবং প্রথমদিকের কিছু নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা। এসময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা যাদের দ্বারা রচিত হয়েছে তারা হচ্ছেন হান্টার (১৮৭৫), ক্লে (১৮৬৮), সাচে (১৯২০), মজুমদার (১৯০৬), প্লেফেয়ার (১৯০৯), সাত্তার (১৯৭৫), এবং বিভিন্ন গেজেটিয়ার।

দ্বিতীয়ত: অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনামূলক

যেসব অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনামূলক গবেষণা সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে এবং যে গবেষণাগুলোতে তারা গারো নৃগোষ্ঠীদের সংগঠন, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক বর্ণনা করেছেন। সে ধরণের গবেষণাগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ পর্যায়ের গবেষকদের মধ্যে ডালটন (১৮৭২), রিজলে (১৮৯১), ওয়েডেল (১৯০১), বোস (১৯৩৫, ১৯৮০), ইবসন (১৯২১), এহরেনফেল (১৯৫৫), এবং নেওয়াজ (১৯৮২) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয়ত: বিবর্তনমূলক

গারোদের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ পর্যায়ের গবেষণাগুলোতে যেখানে আরও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে গারো সমাজের আসন্ন এবং ঘটিত পরিবর্তনের বিবর্তন সম্পর্কে পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। এ সম্পর্কে তাদের মূল্যবান গবেষণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুখার্জী (১৯৫৫, ১৯৫৭), গোস্বামী ও মজুমদার (১৯৬৫, ১৯৬৮, ১৯৭২),

Dhaka University Institutional Repository

গোস্বামী (১৯৬৯), কার (১৯৭০, ১৯৮২), মজুমদার (১৯৭৮), নাকনে (১৯৬৭), বারলিং (১৯৬৩), মিল্টন (১৯৮১), ভট্টাচার্য (১৯৭৮), খালেক (১৯৮৩), এবং আরও অনেকে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে যখন থেকে গারো জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বর্ণনা এবং বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা শুরু হয়েছিল সেই সূচনাপর্ব থেকে পরবর্তী সময় পর্যন্ত কালানুক্রমিকভাবে এই গবেষণাগুলোকে প্রকরণ করা যায়। নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী যেমন রায় (১৯২২), মজুমদার (১৯৫০), গৌরী (১৯৫৬), দুবে (১৯৫২), বোস (১৯৬৩), বিদ্যারথী (১৯৬৬) এবং সিনহা (১৯৬৮) প্রমুখরা আদিবাসীয় গবেষণাসমূহকে বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিক প্রকরণে বিভক্ত করেছেন। কালানুক্রমিকভাবে ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী বিদ্যারথী আদিবাসীয় গবেষণাসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো -

১. রূপদায়ক (formative, 1774-1919)

২. গঠনমূলক (constructive, 1920 - 1949); এবং

৩. বিশ্লেষনাত্বক (analytical, 1950-)।

(বিদ্যারথী (১৯৭২:৩৬; ১৯৮০:৯)

বিদ্যারথীর বিভাগ অনুসারে রূপদায়ক পর্বের গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হান্টার (১৮৭৫), ক্লে (১৮৬৮), প্লেফেয়ার (১৯০৯), মজুমদার (১৯০৬); গঠনমূলক পর্বের গবেষণা সমূহের উল্লেখযোগ্য গবেষক হচ্ছেন বোস (১৯৩৫), হডসন (১৯২১); এবং বিশ্লেষনাত্বক গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুখার্জী (১৯৫৫), গোস্বামী এবং মজুমদার (১৯৭২, ১৯৬৮, ১৯৬৫), নাকনে (১৯৬৭), নেওয়াজ (১৯৮২), খালেক (১৯৮৩), বারশিং (১৯৬৩), কর (১৯৮২, ১৯৭০), মিল্টন (১৯৮১) প্রমূখ। এই সব প্রকরণ সমূহ ছাড়াও কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণার আলোচনা এখানে সন্নিবেশিত হলো।

The Garos, 1909

(Playfair)

প্রথম পর্যায়ে যিনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গারো আদিবাসী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি ব্রিটিশ প্রশাসক প্লেফেয়ার (১৯০৯)। তিনি গারো অধ্যুষিত অঞ্চলে জেলা প্রশাসক হিসাবে বেশ কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে গারোদের স্থায়ী আবাসন গ্রহণের পূববর্তী অবস্থা, জীবন-যাপনের ধরন এবং সংস্কৃতি। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে গারো সমাজের আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতি-নীতি। অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে সেই গ্রামের কথা যে গ্রাম থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেহেতু তিনি গারো ভাষা জানতেন তাই তিনি অত্যন্ত সফলভাবে গারো লোকসংস্কৃতি এবং আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভারতের আসাম রাজ্যের অন্তর্গত একটি গারো পল্লীতে তার গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করেন। তার রচনায় তিনি প্রথম উল্লেখ করেন যে গারোদের কোন বর্ণমালা নাই। এরই সূত্র ধরে তিনি আরও উল্লেখ করেন গারোদের জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বসহ গারো জনগোষ্ঠীর কোন লিখিত ইতিহাস নাই। গারো জনগোষ্ঠীর ওপর লিখিত তার গবেষণাটি একটি প্রামাণ্য বর্ণনা হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বইটি উপস্থাপন করেছেন গারোদের একটি "জাতিতাত্ত্বিক" বর্ণনা হিসাবে। তিনি গারোদের কাছ থেকে উৎসারিত তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, লৌকিক উপ্যাখান জানার পর তা লিপিবদ্ধ করেন। এজন্যই তার লেখাটি গারোদের সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্যে লৈখিক উৎস হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি গারোদের সমাজ কাঠামো ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন গারোদের সমাজ কাঠামো মূলত মাতৃতান্ত্রিক যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে একবোরেই ভিন্ন। গারো সমাজ জীবনে বিশেষ করে পেশাগত জীবনে, ঐতিহ্য, বিবাহপ্রথা, ধর্মবিশ্বাস ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েও গারো সমাজে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা আজও টিকে আছে।

Rangsanggri: Family and Kinship in a Garo Village, 1963

(Robbins Burling)

বারলিং একজন আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী । তিনি ১৯৬৩ সালে গারো জনগোষ্ঠীর ওপর একটি গবেষণা সম্পন্ন করেন। তার গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল গারোদের সমাজ কাঠামো এবং জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা। তিনি ভারতের একটি গারো পল্লীতে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তার গবেষণাটি পরিচালনা করেন। যদিও তার মূল উদ্দেশ্য ছিল গারো সমাজে সমাজ ব্যবস্থা এবং জ্ঞাতি সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা তারপরও তিনি সমাজের অন্যান্য উপাদানসমূহ যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। তিনি আরও পর্যালোচনা করেছেন বাইরের সমাজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, নতুন কৃষি পদ্ধতি, এবং খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরন প্রক্রিয়া যা সমাজ পরিবর্তন এবং রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বৃহত্তর সমাজের সাথে গারোদের সম্পর্ক পর্যবেক্ষন করেছেন। তিনি গারো সমাজের একটি সাধারণ সূত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন প্রায় প্রতিটি গারো পশ্চাদপদ এবং দারিদ্র্যে নিমজ্জিত।

Social Institutions of the Garo of Magalaya, 1972

(Goswami and Majumder)

ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী গোস্বামী ও মজুমদার অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গারো সমাজ ব্যবস্থা এবং দ্রুত ঘটমান পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করেছেন। নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে তারা ভারতের মেঘালয়ের একটি গারো পল্লীতে গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁরা ভারতীয় গারো সমাজে পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করেন। তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে সামাজিক সংগঠনসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ভূমি মালিকানায় ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তি মালিকানা ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে। এছাড়াও এ গবেষণাটিতে আইনগত অবস্থা, গারো সমাজের মহিলাদের অবস্থান এবং অবস্থানের কারণসমূহ আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Glimpeses of Tribal life in North-East India, 1980

(J.K. Bosc)

বোস (১৯৮০) তাঁর বিভিন্ন সময়ে গারোদের ওপর লিখিত প্রবন্ধসমূহ একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে গারোদের সামাজিক সংগঠনের ওপর আলোকপাত করা ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত গবেষণাসমূহের অভিজ্ঞতালব্ধ বহিঃপ্রকাশ। তিনি মূলতঃ বিশ্লেষণ করেছেন সামাজিক সংগঠন সমূহের দ্বন্দ্ব, ক্রস কাজিন সম্পর্ক, লেভিরেইট, আন্তগোষ্ঠীয় বিবাহ ব্যবস্থা, গারো সমাজের শ্রেণী বিভাজন, গারোদের লোকরোম প্রথা, বাংলাদেশের গারোদের উত্তরাধিকার আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি। যাহোক, বোস প্রধানত পর্যবেক্ষন করেছেন গারো সমাজের প্রতিষ্ঠান ও প্রথা এবং তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন গারোদের সামাজিক প্রথা এবং সংগঠন সমূহের পরিবর্তনসমূহ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, এই গবেষণাটি গারো সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রথম তথ্য সমৃদ্ধ ও পর্যবেক্ষিত পদক্ষেপ এবং দিক নির্দেশনা। এর তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

History and Culture of the Garos, 1981

(Sangma S. Milon)

সাংমা নিজে একজন গারো যিনি ১৯৮১ সালে তার গবেষণাটি পরিচালনা করেন। তিনি তার নিজস্ব জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের চিত্রটিকে মূল উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গবেষণাটিতে আরও বিধৃত হয়েছে গারো জনগোষ্ঠীর জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক পটভূমি। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন গারোদের পৌরানিক কাহিনীসমূহ, ঐতিহ্য এবং পরবর্তীতে ঘটিত ও ঘটমান পরিবর্তনসমূহ।

The Garos in Transition, 1982

(P.C. Kar)

অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে কার ১৯৮২ সালে পূর্ব ভারতীয় গারো জীবনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গারো জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হন। পরবর্তীতে তিনি আরও বর্ণনা দেন কিভাবে এই পরিবর্তনের ফলে গারো সমাজ জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে; যেমন-জুমচাষ ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা থেকে সেচভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিতে প্রবর্তন, ভূমির স্বল্পতা ইত্যাদি। অর্থাৎ গারোদের ঐতিহ্যবাহী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিকল্প ধারা প্রবর্তিত হচ্ছে তার ফলে তারা যে সমস্যার মোকাবিলা করছে কার বিশেষভাবে সে দিকটি উল্লেখ করেন। তিনি আরও মনে করেন এসব পরিবর্তনের ফলে ক্রমান্বয়ে গারোদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বিশাল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

লেখক আরও বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে গারোদের ঐতিহ্যবাহি বিনিময়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক সম্মিলিত শ্রমবিভাজন, গোষ্ঠী মালিকানা, জুমচাষ, উৎপাদন ব্যবস্থায় সংহতি ও সম্পর্কের প্রভাব, প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে আধুনিক আর্থব্যবস্থা নির্ভর অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তিনি আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন কিভাবে একটি পৃথক অর্থনৈতিক স্বার্থ, ব্যক্তি মালিকানা, আয়ের অসমতা, এবং এর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা একটি ঐতিহ্যমূখী এবং স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে। এর ফলে সমস্ত গারো সামাজিক ব্যবস্থা ক্রমশ রূপান্তরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই গবেষণাটি গারোদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবীদার। এখানে আরও সন্নিবেশিত হয়েছে গারোদের লুপ্তপ্রায় কিছু মৌখিক ঐতিহ্যের লিখিতরূপ। লেখক ব্যক্তিগতভাবে গারো অঞ্চলে ভূমি এবং সামাজিক জরীপ পরিচালনা করেছেন যা গারোপাহাড়ের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক চিত্র পেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

The Sylvan Shadows, 1983

(A. Sattar)

আবদুস সাত্তারের "The Sylvan Shadows" বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত প্রধান প্রধান আদিবাসীদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্যবহুল একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ। এটি ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রধান আদিবাসীগোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যেমন-চাকমা, হাজং, ঋসী, মুরং, সাঁওতাল, পাহাড়ী, গারো প্রভৃতি। গারো আদিবাসী গোষ্ঠীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি ময়মনসিংহ শহরের নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। তিনি মনে করেন ময়মনসিংহ হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশাল ভান্ডার। সেই সাথে এখানে রয়েছে নানা আদিবাসীগোষ্ঠীর বিচরণ যা একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এটি নৃতাত্ত্বিকভাবে আগ্রহ জাগানো একটি স্থান যেখানে মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করছে বিভিন্ন আদিবাসীয় গোষ্ঠী। তিনি আরও উল্লেখ করেন এখানে বসবাসরত আদিবাসীদের মধ্যে গারো হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। এখানে গারোদের প্রধানত দু'টি বিভাগ দেখা যায় যাদের স্থানীয়ভাবে বলা হয় "আচিক" বা "পাহাড়ী গারো" এবং "লামদানী" বা "সমতলীয় গারো"।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উল্লেখ করেন যে গারোদের মধ্যে গোত্র প্রথা রয়েছে। পাহাড়ীগারোদের গোত্ররা আউই, আবেং এবং দুয়াল প্রধানত এই তিন ভাগে বিভক্ত। সমতলীয় গারোদের প্রধানত তিনটি প্রকার আছে- মমিন, মারাক, এবং সাংমা। মাতৃকূলে অর্ন্তগোষ্ঠীয় বিবাহ গারোদের মধ্যে নিষিদ্ধ। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। সেখানে সম্পত্তি মালিকানা, হস্তান্তর এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে মহিলারা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে গারোদের সর্বপ্রাণবাদী বলা যেতে পারে। তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্বপুরুষ পূজা, প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে কেন্দ্র করে পালিত হয়। গারো জনগোষ্ঠীর অনেক লৌকিক এবং পৌরানিক কাহিনী আছে। উৎপাদন মূলত কৃষিভিত্তিক। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তাদের ধর্মবিশ্বাস ব্যবস্থার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বিচিত্রতা সামাজিক এবং ব্যক্তিজীবনের সর্বোত্র বিরাজমান।

তিনি আরও বর্ণনা করেন যে গারোদের লোক সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ। তাদের লোককাহিনী মূলত প্রকৃতি নির্ভর। কিভাবে পৃথিবীর উৎপত্তি হলো, নদী ও ঝর্ণার উৎপত্তি, বৃক্ষরাজি, সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের উৎপত্তি এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে গারোদের লোকগাঁথা প্রচলিত আছে এবং বিশ্বাস, সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তারা এসব অনুষ্ঠান ও পূজা-আর্চনা পালন করে থাকে। গারোরা মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে কিছু রীতিনীতি এবং প্রাতকৃত্য অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এরপর তারা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। তারা পুন:জন্মে বিশ্বাস করে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু নৈতিক নিয়ম-কানুন প্রচলিত আছে, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ নয়। পাহাড়ী এবং সমতলীয় গারোদের খাদ্যাভ্যাস মোটামুটি একই রকম। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া তারা সবজী, মুরগী, খাসী, গরু, শূকর, এবং অন্যান্য প্রাণীর মাংস তারা মেরে খেয়ে থাকে। কিন্তু বিড়ালের মাংস খাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

তিনি এ গ্রন্থটিতে গারোদের সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক অবস্থা, গারো সংস্কৃতি, উৎসব, আনুষ্ঠানিকতা, আইন-কানুন, উত্তরাধিকার, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা দেন। তিনি গারো সমাজ জীবনের পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব, নগরায়ন এবং শিল্পায়নের প্রভাব, যা তাদের সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

আবদুস সাত্তারের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তার বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। কিন্তু লেখক পেশাগতভাবে নৃবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী না হওয়ায় তিনি নৃতাত্ত্বিকভাবে গারো সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই।

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি গারোদের "উপজাতি" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে এই শব্দটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত। কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে "উপজাতি" শব্দটির ব্যবহার যথেষ্ট অসম্মানজনক এবং মানবতার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়।

তিনি উপজাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে যারা এদেশের আদিবাসিন্দা ছিল তাদেরকে আমরা উপজাতি নামে আখ্যায়িত করে থাকি" (সাত্তার, ১৯৮৩ঃ১৮)।

তাহলে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কি আর্যদের বংশধর। সাত্তার বরেন্দ্র অঞ্চলের পুন্ড্রদের কথা উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের উপজাতিদের পূর্বপুরুষ হিসাবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আর বিশেষ কিছু উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেছেন এ অঞ্চলে আদিম মানুষ বসবাস করতো। সেসব আদিম মানুষের উত্তম পুরুষরা নানা মত-প্রতিমতে টিকে আছে এবং তারাই বর্তমানে গারো সমাজ" (সাত্তার, ১৯৮৩: ১৮)।

আমি এক্ষেত্রে মনে করছি গারোদের তিনি আদিম মানুষের উত্তরসূরী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাহলে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিচয় কি হবে? গারো নৃগোষ্ঠী যদি আদিম মানুষ হয়, তাহলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কার প্রতিনিধিত্ব করছে?

লেখক আবদুস সাত্তার গারো সমাজের বিভিন্ন দিক যথাসাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। অনেক মত পার্থক্য সত্ত্বেও তার বইটি গারো নৃগোষ্ঠীর জীবনাচরণ সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য বই।

Garo Kinship Terminology: Idealization and Reality, 1983

(Professor K. Khalaque)

ডঃ কিবরিয়ারুল খালেক "গারো জ্ঞাতি সম্পর্কঃ আদর্শ এবং বাস্তবতা" শিরোনামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন যা ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি এখানে মূলত গারো সমাজের জ্ঞাতি সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি গারোদের জ্ঞাতি সম্পর্কের কাঠামো, পরিবারের ধরণ ও গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত নিখুঁত ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু গারো সমাজের আদর্শ ও জ্ঞাতিসম্পর্কের রূপটিই আলোচনা করেন নাই, সেই সাথে এর ব্যবহারিক রূপটিও আলোচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, প্রানোজ্জ্বল এবং যৌক্তিকভাবে গারো সমাজের অভ্যন্তরীন সম্পর্ক এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণ সহ বাস্তবিকভাবে এর ব্যবহারকারিতা তুলে ধরেন। তিনি গারোদের সমাজ ব্যবস্থা আরও গবেষণা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Garo Matrilineal Cross-Cousin Marriage: Continuty and Discontinuity, 1984

(Professor K. Khalaque)

কিবরিয়ারুল খালেক এমন একজন নৃবিজ্ঞানী যিনি বেশ কিছু সময় গারোদের সাথে অবস্থান করেছেন এবং কাজ করেছেন। তিনি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবস্থান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গারো সমাজের পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন কিভাবে গারোরা তাদের ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ পদ্ধতি পরিহার করে সেচ কৃষি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন গারোরা সামাজিক কাঠামো ক্ষেত্রে নয়টি কাঠামোর অনুসারী। তিনি গারো সমাজে প্রচলিত নক্সা এবং এগেইট পদ্ধতি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। এই নীতিগত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র নক্না (পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা) তার মায়ের মৃত্যুর পর সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

তিনি গারোদের খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। মিশনারীরা গারো অধ্যুষিত অঞ্চলে শুধু প্রাথমিক শিক্ষানির্ভর বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, বরং তারা সেখানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। এছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের স্বউৎপাদিত স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থার বিপরীতে তারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমাজে শ্রেণীবিভাজনের সৃষ্টি করেছে। যে গারো সমাজ কাঠামো এতদিন ছিল শ্রেণীহীন, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে তা শ্রেণীবিভাজিত সমাজে পরিণত হয়েছে। পরিবর্তন এসেছে গারোদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও। গারোদের ঐতিহ্যবাহী মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ক্রমশঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ডঃ খালেক গারো সমাজের সমালোচনায় বলেছেন গারো সমাজ কাঠামো কখনই নিরঙ্কুশভাবে মাতৃতান্ত্রিক ছিল না। সমাজ এবং পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সবসময়ই কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকে, যেমন কোন বহিঃআক্রমন প্রতিহত করা, যুদ্ধ পরিচালনা করা, শিকার, এমনকি কৃষিকাজ তথা উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তিনি গারো সমাজে পাঁচটি প্রধান গোত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন এবং এগুলো হলো- যথা মারাক, মোমিন, সাংমা, সিরা এবং আরেং। তিনি আরেকটি পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে শুধুমাত্র নক্মাই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছে না, এগেইটরাও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে। মিশনারীদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গারো নৃগোষ্ঠী শুধুমাত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে যা সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাব রাখছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ঐতিহ্যবাহী পেশার পরিবর্তে আধুনিক পেশা গ্রহণ এবং জটিল সমাজের সংস্পর্শ গারো সমাজ কাঠামোতে রূপান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ খালেক মূলতঃ উপজীব্য করেছেন গারোদের বৈবাহিক পদ্ধতি যা তিনি বর্ণনা করেছেন বিস্তারিত

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব, বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাব, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্রতিটি বিষয় তিনি ভিন্নভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

Garo Society in Transition, 1984

(A. Nawaz)

এ, নেওয়াজ তার রচনায় গারো জনগোষ্ঠীর বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে মূলতঃ গারোরা গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং ভারতের জেলায় বসবাস করে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাহাড়, বনাঞ্চল, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী, বিচিত্র প্রাণী এবং পাখী। মনে করা হয় এই যাযাবর গোষ্ঠী চীন দেশ থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করে। এদের ভাষাতত্ত্ব সিনো-টিবেটান এবং শারিরিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলয়েড প্রকৃতির। লেখক এ তথ্যটি গ্রহণ করেছেন আদিবাসী সংস্কৃতির তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ থেকে। গারো সমাজ ব্যবস্থায় একমাত্র কনিষ্ঠকন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিযুক্ত হয়। আদিম সমাজের অনুরূপ কৃষি ব্যবস্থা এবং ভূমিতে গোষ্ঠী মালিকানা বিদ্যমান এবং এটি শ্রেণীহীন, জাতিবর্ণহীন সমাজ ব্যবস্থা। গোত্র সম্পত্তির দেখাশুনা করে এবং মালিকানা ভোগ করে। এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে সম্পত্তির স্থানান্তর করাকে বিরোধিতা করা হয়। একই দৃষ্টিতে গোত্রের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এমনকি সম্পত্তি মালিকানা অক্ষুন্ন রাখতে একজন বিধবা প্রায়ই তার কনিষ্ঠ জামাতার স্ত্রীতে পরিণত হয়। এমন ক্ষেত্রে দেখা যায় মা এবং মেয়ে একই বাড়িতে একই ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে।

নেওয়াজ আরও উল্লেখ করেন গারোরা এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকে যাকে তারা জুম চাষ বলে। এটা গারোদের নিজস্ব পদ্ধতি। তারা দেবতার সন্তুষ্টির জন্য প্রাণী উৎসর্গ করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন বেশ কিছু সংখ্যক কুঁড়ে ঘর একসাথে স্থাপন করা হয় যাকে বলা হয় "নকপান্তে"। গারো ছেলেদের সাধারণত সামাজিকতা শেখানোর জন্য কিশোর থেকে যুবক বয়সে এখানে পাঠানো হয়। অনেক সময় এখান থেকে গারো ছেলেদের বিবাহের উদ্দেশ্যে কনে তার পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণ করা হয় যা সাধারণত অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় না। গারোদের অর্থনীতি মূলতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিনিময়ভিত্তিক। বর্তমানে গারো নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ মিশনারীদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় স্থাপন এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান এর অন্যতম কারণ। খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণের পর বর্তমানে গারোদের মধ্যে পূর্ব প্রচলিত বিধবা বিবাহ দেখা যায় না। ছেলেদের "নকপান্তে" কুড়েঘর থেকে অপহরন সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। গারো কৃষি পদ্ধতি আর জুমচাষভিত্তিক নয়। বর্তমানে তারা বৃহত্তর সমাজে প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতেই চাষ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

Garo Village in Bangladesh: A Sociological Study, 1986

(Dr. Zahidul Islam)

এটি গারোদের সমাজ ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত একটি মূল্যবান গবেষণা। এখানে ড. ইসলাম অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং সামাজিক জরীপ-এ দু'টো পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তার গবেষণার মূল উপজীব্য ছিল গারোদের আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন, সামাজিক স্তরায়ন এবং গারো নৃগোষ্ঠীদের সমাজকাঠামোর পরিবর্তন। তিনি লক্ষ্য করেন গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং গারো সমাজে আরও বহুবিধ এবং বহুমাত্রিক পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটছে। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গারো সমাজে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

The Garos of Bangladesh: An Overview, 1991

(Dr. Zahidul Islam)

ডঃ জাহিদুল ইসলাম এর এই প্রবন্ধটি ১৯৯১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা "Social Science Review" এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ডঃ ইসলাম বাংলাদেশের শেরপুর জেলার আনধাপাড়া নামক একটি গ্রামে গারো নৃগোষ্ঠীর ওপর ক্ষুদ্র আকারে তাঁর গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন। তিনি গারোদের সুনির্দিষ্ট পরিচয়, অবস্থান এবং সংস্কৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন কিভাবে আভ্যন্তরীন এবং বহির্বিশ্বীয় উভয় কারণ তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনধারাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। তিনি গারো জনজীবনের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের সমাজ চিত্র অংকন করেছেন। গারো সমাজ জীবনের কিছু সাধারণ বিচার্য বিষয় যেমন সাংস্কৃতিক পৃথকীকরন এবং আত্মীকরন প্রভৃতি বিষয়সমূহকে তিনি অন্ত বীক্ষন এর চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণাটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন আধুনিক শিক্ষার প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তৃতি, গারোদের সমাজ কাঠামো, পারিবারিক প্রকরন, বংশধারা, ধর্মীয় সংগঠন, স্থানীয় নেতৃত্বের ধরন, কৃষি পদ্ধতি, উত্তরাধিকারের ধরন, প্রভৃতি যা তাদেরকে ক্রমশঃ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং সমগ্র সমাজকে পরিবর্তিত করছে। তিনি আদিবাসীয় এ গোষ্ঠীর স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোজার জন্যে, ভাল জমি পাওয়ার জন্যে এবং রাজনৈতিক হয়রানি থেকে রক্ষার জন্য তারা মূলতঃ স্থানান্তর করে থাকে। জমি হচ্ছে গারো জীবন এবং অর্থনীতির মূল। জমিতে গোষ্ঠীমালিকানা বিলুপ্ত হয়ে সে স্থানে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে গারো জীবনে মালিকানা এবং উত্তরাধিকার মহিলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো তা এখন দ্রুত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্যভাবে গারো গোত্র সংগঠন প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত; যথা- মাচং এবং মাহারী। সম্পত্তি অধিকার, সামাজিক বা অন্য কোন সমস্যা সমাধানে গোত্রের ভূমিকা যথেষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আনধাপাড়া গ্রামে ১৮টি উপগোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। বাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপ্রবেশ নব্য উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে নিয়মিত ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন শিক্ষা, গনমাধ্যমের প্রকাশ এবং নগর জীবনের সংস্পর্শ গারো সমাজে পরিবর্তন আনয়নে সরাসরি ভূমিকা পালন করেনি ঠিকই, কিন্তু গারো জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বলয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। পরিশেষে এই গবেষণাটির মাধ্যমে আমরা যে সামাজিক সংশ্লিষ্টতার দিকে অগ্রসর হতে পারি তাকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠি বর্তমানে আর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন নৃগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে না। শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা, খৃষ্টধর্মের প্রভাব, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার বিস্তার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ আরও অনেক বেশী প্রকাশমান। এক্ষেত্রে আধুনিক গণমাধ্যম, নগর সংস্কৃতি ও জীবনের ধরণ ইত্যাদির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আদিবাসীরা বৃহত্তর সমাজ থেকে তাদের পৃথক স্বতন্ত্র পরিচয় আজও বহন করে চলেছে।

তৃতীয়তঃ ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিকতার প্রভাবে গারো সমাজ ক্রমশ: পিতৃতান্ত্রিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

চতুর্থতঃ গারো আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পেশাগত গতিশীলতা এবং বহুমাত্রিকতার সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চমতঃ বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠী ক্রমশ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটা অংশে পরিণত হচ্ছে। তারা একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে যা অন্যান্য নৃগোষ্ঠীগুলোও সমানভাবে মোকাবেলা করছে।

এই মূল্যবান প্রবন্ধটি বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর ওপর একটি অসামান্য দলিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আসলে গারো জনগোষ্ঠীর আদিবাসীয় জীবনের কোন অংশই বর্তমানে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার স্পর্শের বাইরে নেই।

Social Organization Among the Garos in Bangladesh: An Overview, 1992
(Dr. Zahidul Islam)

এই প্রবন্ধে ডঃ ইসলাম গারোদের গোত্র সংগঠনের প্রকরন করেছেন। তার এ লেখাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "Social Science Review" পত্রিকায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিতে গারোদের গোত্র সংগঠনের প্রকৃতি, ভূমিকা এবং কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করেছেন। ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে গোত্রের ভূমিকা কি ছিল, কিভাবে গোত্র সংগঠন গারো সমাজ কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়েছে তাও বর্ণনা করেছেন। এই লেখাটি তিনি মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় অংশগ্রহণের ফলশ্রুতিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি, শিক্ষার প্রভাব, নগরায়ন, শিল্পায়ন, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে গারোদের নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। গারো আদিবাসীদের মধ্যে ১২টি গোত্রের কথা প্লেফেয়ার উল্লেখ করেছেন, এবং নাকনে চিহ্নিত করেছেন ৭টি গোত্র। গোত্রগুলোর মধ্যে উপগোত্র আছে। গারোদের বিবাহ এবং পরিবার সংগঠন অর্ন্তগোষ্ঠীয়, কিন্তু বহিগোত্রীয়। গারো মাতৃতান্ত্রিক বংশধারা মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা-সাংমা, মারাক এবং মোমিন (প্লেফেয়ার, ১৯০৯)। পরবর্তীতে সিরা এবং আরেং গোত্র লক্ষ করা যায়। এই গোত্রগুলো আবার মাচং এ বিভক্ত। মাচং অর্থ মা এর বংশধারা। এই মাচংগুলো বিবাহের ক্ষেত্রে বহিঃগোষ্ঠীয় নীতি মেনে চলে। এছাড়া সন্তানের বংশপরিচয়, উত্তরাধিকার, গ্রামে অবস্থান ও নেতৃত্ব, সমস্যা ও সমাধান প্রভৃতি কার্য পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি মাচং এর ক্ষুদ্র উপবিভাগ আছে যাদের স্থানীয়ভাবে মাহারী বলা হয়। মাহারীর সদস্যরা একে অপরের সাথে আত্মীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে। বহিঃগোষ্ঠীয় (সাধারণত মাহারীর বাইরে) এবং ক্রসকাজিন বিবাহকে অধিকতর আকৃষ্ট করার জন্য প্রায় প্রতিটি মাহারীর সদস্যরা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকে। ডঃ ইসলাম আরও উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে কোথাও তিনি সামাজিক বিভাজন দেখতে পান নাই। গবেষক এখানে সূক্ষ্ম এবং সাবলীলভাবে গারো সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং তাদের নীতিমালা ও কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন। লেখক যথেষ্ট সচেতনভাবে গারোদের ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংগঠনে ঐতিহ্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সবদিক থেকেই এই প্রবন্ধটি গারো সমাজের অধ্যয়নে যথেষ্ট মূল্যবান।

Arognauts of The Western Pacific, 1992

(B.K. Malinowski)

এই গ্রন্থটি সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যেখানে গবেষক অবস্থান পর্যবেক্ষন এবং সংখ্যাতাত্বিক পদ্ধতিতে জাতিতত্ত্বের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই গবেষণাটি অত্যন্ত গভীরভাবে আরগোনাট সমাজের প্রতিটি দিক স্পর্শ করে গেছে। এই গ্রন্থে তিনি আরও বলেছেন মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় তিনি কি কি সমস্যার সম্মুখিন হয়েছেন এবং কিভাবে তার মোকাবেলা করেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থটিকে নৃবিজ্ঞানীদের প্রাণশক্তির অন্যতম উৎস বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়, ১৯৯৪

সুভাষ জেং চাম

সুভাষ জেং চাম ১৯৯৪ সালে এই গ্রন্থটি লিখেন। সুভাষ জেংচাম নিজে একজন গারো নৃগোষ্ঠীর অধিবাসী। তিনি নিজে গারো হওয়ায় নিজ গোষ্ঠীর ইতিহাস, সামাজিক অবস্থা, ঐতিহ্য, বর্তমান সমস্যা প্রভৃতি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। মোট বাইশটি অধ্যায় সম্বলিত এই গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমে আলোকপাত করেছেন গারোদের উৎপত্তি ও আদিনিবাস সম্পর্কে। এরপর বলেছেন কিভাবে তারা ভারতীয় উপমহাদেশে আসে এবং বসতি স্থাপন করে বর্তমানে তারা কোন কোন অঞ্চলে বসবাস করছে, গারোদের নামকরণ, তাদের দৈহিক গঠন এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের বর্ণনা, মধ্যযুগ এবং গারোবিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অতীত এবং বর্তমান পেশা, এবং গারোদের বাসগৃহের বর্ণনা। তিনি আরও বলেছেন গারোদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে। লেখক বইটিতে কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন এবং উল্লেখযোগ্য কিছু গারো ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছেন।

সুভাষ জেংচাম নিজে গারো নৃগোষ্ঠীর একজন সদস্য। নিজে গারো হওয়ায় তাঁর গোষ্ঠীর ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট জানেন তথাপি এই বইটিতে তিনি গারো সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে আরও সুক্ষ্ম বর্ণনা দিতে পারতেন।

লেখক জেংচাম গারোদের কিছু চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যা গারো অধিবাসীদের মানসিকতা বুঝতে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। জেংচাম গারোদের মানসিক উৎকর্ষের বিভিন্ন দিক বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন "এক কথায় গারোদের মধ্যে মামলাবাজ বলিয়া চিহ্নিত কোন ব্যক্তি নাই। গুটি কয়েক যে সব মামলা মোকদ্দমা বিভিন্ন কোর্টকাচারীতে বর্তমানে বিচারাধীন, তলাইয়া দেখিলে তাহাও দেখা যায় গারোদের বিরুদ্ধে অ-গারো লোকজনের চাপাইয়া দেওয়া" (জেংচাম, ১৯৯৪ঃ৫৭)। আমার মনে হয় বর্তমানে গারোরা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সচেতন। সুতরাং তারা তাদের অধিকার আদায়েও সচেষ্ট। বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারে। তবে অ-গারো লোকজনই যে সবসময় গারোদের ওপর মামলা চাপিয়ে দেয় এই কথাটি কতটা সঠিক তা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাখে।

লেখক গারো নারীদের অনেক গুণাবলীর কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন "নারী স্বাধীনতার নামে গারো মেয়েরা কোনদিন উচ্ছৃংখল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত? হইয়া ওঠে নাই" (জেংচাম, ১৯৯৪ঃ৫৮)। তবে লেখকের এ বক্তব্যটি সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। তিনি কি মনে করেন যারা নারী-স্বাধীনতার কথা বলে তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। বর্তমানে বিশ্বের সবদেশেই যেখানে নারী-স্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে সেখানে লেখকের এই

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য সব নারী জন্যই অপমানজনক। জেংচাম সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন "আজ এদেশের গারোরা পোশাক-পরিচ্ছদে, মুখের ভাষায়, আহারে-বিহারে বাঙালি সংস্কৃতির মূর্তিমান ধারক ও বাহক। একজন গারো মনে প্রানে অকৃত্রিম গারো" (জেংচাম, ১৯৯৪ঃ৬৫)। লেখকের এ বক্তব্য কিছুটা স্ববিরোধী। তিনি একদিকে গারোদের বলেছেন বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, আবার অন্যদিকে বলেছেন গারোরা মনে প্রানে অকৃত্রিম গারো। তারপরও এককথায় বলা যায় জেংচামের গারো নৃগোষ্ঠী বিষয়ক বইটি একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ন বই।

Bangladesh Land Forest and Forest People, 1995

(Philip Gain)

Society for Environment and Human Development (SEHD) থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের বনাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত একটি বহুল তথ্য সমৃদ্ধ বই। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। প্রথম পত্রটি রচিত হয়েছে ড. কিবরিয়ারুল খালেক কর্তৃক। তিনি প্রধানত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বনভূমি এবং সমভূমিতে বসবাসকৃত বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীদের উপর তার গবেষণা পরিচালনা করেছেন।

"আদিবাসী নৃগোষ্ঠী" বা "আদিবাসীগোষ্ঠী" বলতে আমরা সেসব নৃগোষ্ঠীকে বুঝি যাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি মূল নৃগোষ্ঠী থেকে পৃথক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক জাতিস্বত্তার নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে "উপজাতি" শব্দটির পরিবর্তে "আদিবাসী" শব্দটি ব্যবহার করতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকেন। "উপজাতি" শব্দটিকে অনেকক্ষেত্রে অসম্মানজনক মনে করা হয়। এইসব নৃগোষ্ঠী, যাদেরকে আমরা আদিবাসী বলে চিহ্নিত করে থাকি, তারা বর্তমানে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামরত। এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো তাদের নিজস্ব আবাস রক্ষার জন্য, তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য, তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ও নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি রক্ষার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের ২৭টি আদিবাসীগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সমস্যা এবং সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

The Strong Woman of Madhupur, 1997

(Robbins Burling)

রবিন্স বারলিং-এর এই গ্রন্থটি ১৯৯৭ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। লেখক এ গ্রন্থে বলেছেন জঙ্গল বা বনে বসবাসরত এবং ঢাকা শহরে বসবাসরত উভয় ধরনের গারোদের সম্পর্কেই তিনি জেনেছেন। গারো ইতিহাস সম্পর্কে যা জানা গেছে

Dhaka University Institutional Repository

তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় লেখক সঠিক সময়ে গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন। যাহোক, এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন বাংলাদেশের একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে কিভাবে গারো সমাজ প্রতিনিয়ত আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। একটি নতুন ধরনের কৃষিব্যবস্থা, নতুন ধর্ম বিশ্বাস, একটা নতুন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দ্বিভাষিক প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে অধিকতরভাবে অন্যান্য নৃগোষ্ঠী তথা বৃহত্তর নৃগোষ্ঠীর সাথে অন্তর্ভূক্ত করছে। তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কিত বিষয়ের তাত্ত্বিক বিতর্ক এড়াতে এবং গারো জ্ঞাতি সম্পর্ককে আরও গভীরভাবে জানতে উত্তর-পূর্ব ভারতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দুই বছরেরও অধিক সময় নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা পরিচালনা করেন। তার রচিত এই গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গারোদের ভাষাতত্ত্ব এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের কাঠামো। এছাড়াও তিনি এই জনগোষ্ঠীর পরিবারের গঠণ কাঠামো এবং প্রারম্ভিককালে বহিরাগতদের সাথে তাদের সম্পর্ক, ধর্ম, বিশ্বাস ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন, আবাসের ধরন, আবাসভূমি, স্বাধীনতা, দৃশ্যত এবং অদৃশ্যগত সংস্কৃতির ধরন, অর্থনৈতিক কাঠামো, পশুপালন, কুটির শিল্প, জীবিকার ধরণ প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোকপাত করেছেন। এতে আরও সম্পৃক্ত হয়েছে গারো সমাজে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব, আধুনিক শিক্ষার প্রভাব, বেসরকারী সংগঠন সমূহের প্রভাব, সম্পত্তি, চিকিৎসাব্যবস্থা, দ্বিভাষিক অবস্থান, ঢাকা শহরে গারোদের (মান্দি) অবস্থা, পেশা ও দৈনন্দিন জীবন, এবং পরিশেষে অনাগত ভবিষ্যতে যে সব বিষয় গারো জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কেও তিনি একটি ধারনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তদুপরি তার গ্রন্থ বিশ্লেষণে নিম্নরূপ কিছু সমালোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

রবিন্স বারলিং সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের গারোদের দেখেছেন। একজন বিদগ্ধ নৃবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি গারো সমাজ ব্যবস্থাকে আরও বিশ্লেষণ করতে পারতেন। তিনি বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীকে 'মান্দি' হিসাবে সম্বোধন করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন এবং ভারতীয় গারোদের গারো হিসাবে অভিহিত করেছেন। বারলিং বলেছেন গারো মহিলারা একজন আগন্তুক বা বহিরাগত ব্যক্তির সামনে অনেক বেশী সপ্রতিভ যা বৃহত্তর সমাজের মুসলিম এবং হিন্দু মহিলাদের মধ্যে তিনি দেখতে পাননি। তাঁর এই মনোভাব পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন বলে আমি মনে করি। বারলিং গারো জনগোষ্ঠীর জীবন যাপন পদ্ধতি এবং গারো সমাজব্যবস্থাকে দেখেছেন অনেকটা ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার মনে হয় তিনি গারো সমাজ ব্যবস্থার আলোকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর গবেষণাটি পরিচালনা করতে পারলে ভাল হতো। বিশেষ করে যেভাবে তিনি গারো মাতৃবংশী সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরছেন তাতে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার প্রভাব আছে বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচকদের মতে এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ যেখানে গারো জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অত্যন্ত গোছানো এবং পরিপাটিভাবে এখানে তথ্য এবং লেখকের অভিমত উভয়ই স্থান পেয়েছে। আরও নির্দিষ্টভাবে তিনি নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অবস্থান পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তাত্ত্বিকভাবেই বিতর্ক এড়াতে তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কে আরও গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। সবদিক বিবেচনায় এই গ্রন্থটির বিশেষ নৃবৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে।

হাজংদের সমাজ ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিন্যাসঃ একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ১৯৯৮

ডঃ জাহিদুল ইসলাম

ডঃ জাহিদুল ইসলাম এর এই মুল্যবান প্রবন্ধটি সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় (বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১) প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি প্রথমে "উপজাতি" প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন মূলতঃ বৃটিশ উপনিবেশিক শাসক বর্গ তাদের সকল শাসন কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে নৃতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিল যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিল তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড। এই প্রক্রিয়ায় তারা এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন নামকরণে দ্বিধাবিভক্ত করে, যেমন কখনও ইনডিজেনাস (Indigenous), ট্রাইবাল (Tribal), তফসিলী ট্রাইবস (Schedule Tribes), অ্যাবারিজিন্স (Aborigines), আদিবাসী (Adhivashasi), পাহাড়ি (Pahari) এবং জুম্মা (Zhumma) । এই সমস্ত নামকরণের মধ্যে লুকিয়ে ছিল শাসন, শোষণ, সংহতি, বিরোধ, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিরোধ এবং বৃহত্তর সমাজের হীনমন্যতা। ফলে দীর্ঘকাল ধরে এই নৃগোষ্ঠী (ethnic group) সমূহের সাথে পার্থক্য ঘটেছে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের। এর ফলে পশ্চাদপদ নৃগোষ্ঠীগুলোর জীবনধারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজ থেকে পিছিয়ে পড়ে। এর প্রভাবে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বকীয়তা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, এবং সহজ সরল জীবনধারা যা বৃহত্তর সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতা বৈচিত্রময় জাতীয়তাবাদ বিকাশের একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। নৃগোষ্ঠী সমূহকে প্রত্যয়গত ধারণা তৈরী করতে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞাগুলো সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক ধারণা তৈরী করেছে। এই ধারণাগুলোর ব্যাপকতায় সমাজবিজ্ঞানীরা আজও কোন একক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেন নাই।

ডঃ ইসলাম হাজং নৃগোষ্ঠীর স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন বস্তুনিষ্ঠভাবে। বাংলাদেশে সরকারীভাবে যে সব নৃগোষ্ঠীসমূহকে চিহ্নিত করা হয়নি হাজং নৃগোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাজংরা বর্তমানে দ্বিতীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে এদের সংখ্যা ২০,০০০ এর মতো। এরা ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কালক্রমে এদেশে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাজংদের নিজস্ব ভাষায় "হাজং" মানে সাজসজ্জা। কারো মতে কাছারীভাষায় "হা" অর্থ পাহাড় এবং "জো" অর্থ পর্বত। পাহাড়-পর্বতে বাস করে বলে এদেরকে কাছারী ভাষায় "হাজো" বলা হতো। হাজো নামের অপভ্রংশ হয়ে কালক্রমে হাজং নামের উৎপত্তি হয়। হাজংরা মনে করে তাদের আদি নিবাস চীন এবং নেপালে, তাদের পূর্বপুরুষরা কোন এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীন থেকে নেপালের পাহাড় পর্বত এবং জঙ্গলে প্রবেশ করে। কালক্রমে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এসে বসবাস শুরু করে। বৃটিশ প্রশাসক এবং নৃবিজ্ঞানী ডালটনের মতে হাজংরা আসামের আদি অধিবাসী এবং কাছারী নামক বৃহত্তর জাতির শাখাভুক্ত।

হাজংরা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে। এদের সমাজকাঠামোকে নৃতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐতিহ্যগতভাবে এরা সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে তাদের সমাজ কাঠামো গঠন করেছে যা রাষ্ট্র কাঠামোর এবং ব্যবস্থাপনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই নৃগোষ্ঠীটি তাদের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিটি সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ দিকে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করেছে। প্রথমতঃ সমাজের সর্বনিম্ন ব্যবস্থাটির নাম "গাও"। কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি গাও গঠিত হতো, এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন "গাওবুড়া"। গাওবুড়া হিসাবে 'গাও' এর প্রধান সৎ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়। গাও এর যে কোন সমস্যার সমাধান করা তার প্রধান দায়িত্ব। দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি 'গাও' নিয়ে গঠিত একটি গ্রাম, যার প্রধান কর্তা ব্যক্তি হচ্ছে 'মোড়ল'। মোড়ল গ্রামের যে কোন সমস্যা গাওবুড়াদের সহযোগিতায় সমাধান করে থাকেন। তৃতীয়তঃ কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হয় চাকলা বা জোয়ার। চাকলার প্রধানকে বলা হয় চাকলাদার বা জোয়ারদার। চাকলা প্রধান বা গাওবুড়া এবং মোড়লদের সহায়তায় চাকলার (গ্রামের) যাবতীয় সামাজিক আচার ও বিচার করে থাকেন। কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে দোষী ব্যক্তিকে চাকলা থেকে বহিস্কার করার ক্ষমতা এদের আছে। চতুর্থতঃ যে স্তরের ভিত্তিতে রাজা নির্বাচিত হত তাকে বলা হতো পরগনা। কয়েকটি চাকলা বা জোয়ার নিয়ে পরগনা গঠিত। রাজা হলেন পরগনা প্রধান। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং পরগনার সকল সমস্যার সমাধান করে থাকেন।

হাজং সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসের লক্ষনীয় দিক হচ্ছে কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা হস্তগত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে প্রতিটি ধাপ ক্ষমতার দিক থেকে স্বাধীন। এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিন্যাসটি বংশানুক্রমিক বা আরোপিত নয়, এটা অর্জিত ক্ষমতা। ঐতিহ্যগত এই সমাজের ক্ষমতা বিন্যাসটির মধ্যে লুকিয়ে আছে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপাদানসমূহ। বাংলাদেশের এই পশ্চাৎপদ নৃগোষ্ঠীটি সম্পর্কে এখনও কোন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয় নাই। ফলে তাদের সমাজের গতানুগতিক অনেক কিছুই সামাজিক পরিবর্তনে হারিয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি ও কালচার: বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, ২০০২

সুগত চাকমা

এখানে লেখক বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আদিবাসীগোষ্ঠী সমূহের পার্শ্বচিত্র অংকন করেছেন। তিনি উল্লেখ্য করেন মাতৃতান্ত্রিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যের জন্য গারো আদিবাসীগোষ্ঠী অন্যান্য আদিবাসীগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পত্তি, অধিকার ও উত্তরাধিকার মূলত: নারীকেন্দ্রিক ও মা থেকে কন্যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসরত মোট গারো জনসংখ্যা ১,০২,০০০ জন (বা.প.জ., ১৯৯১)। প্লেফেয়ার যখন তাঁর গবেষণাটি পরিচালনা করেছিলেন তখন এখানে গারো জনসংখ্যা ছিল ৩৪,১৮০ জন (প্লেফেয়ার, ১৯০৯: ২৪)। ভারত থেকে আগত এই জনগোষ্ঠী মূলত বসবাস করে বাংলাদেশের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং সিলেট জেলায়। বর্তমানে তারা ছোট বড় বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্তভাবেও বসবাস করছে।

নৃতাত্ত্বিকভাবে গারোরা মঙ্গোলয়েডগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। গারো নামের উৎপত্তি সম্পর্কে প্লেফেয়ার বলেন "গারো" অথবা "গাংচিঙ" পাহাড়ে একটি আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করত। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই "গারো" শব্দ থেকেই গারো নামের উৎপত্তি। গারোরা নিজেদের বহিরাগত মানুষের কাছে "আচিক (পাহাড়ি), "মান্দি" (মানুষ) অথবা "আচিক মান্তি" নামে পরিচয় দিতে বেশী পছন্দ করে থাকে। করম শাহ নামে একজন দরবেশ, হাজং, কোচ, এবং গারোদের ঐক্যবদ্ধ করেন চাপতি নাকমা মৃত্যুর পর। মূলত: গারো জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস। তারা সংগ্রাম করেছে আইনগত অধিকারের জন্য, সংগ্রাম করেছে নিজেদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য। যখন তারা বুঝতে পেরেছে তারা বৃহত্তর বাংলাদেশের একটা অংশ তারা তখন দেশের জন্য দেশের কাজে অবদান রাখতে শুরু করেছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে গারোদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্ত গারো সমাজ ৫টি গোত্র এবং ১৭টি উপগোত্রে বিভক্ত (জেংচাম ১৯৯৪: ৩৫)। তারা এই উপগোত্রগুলোকে "মাহারী" বলে থাকে যা মূলত মাতৃবংশীয়। কনিষ্ঠ কন্যা সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জন করে থাকে। গারো পিতা পরিবারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। নকমা (কনিষ্ঠ কন্যা) এর স্বামী (নোকরম) স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একই মাহারীতে বিবাহ নিষিদ্ধ। গ্রামের প্রধানকেও নকমা বলা হয়।

গারো মহিলারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে থাকে, একে বলা হয় 'দকমান্দা'। পুরুষরা কর্মক্ষেত্রে শার্ট-প্যান্ট পরে থাকে । বয়স্ক পুরুষরা ধূতি এবং লুঙ্গি পরে। বর্তমানে অধিকাংশই খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী। এরা বড়দিন এবং অন্যান্য খৃষ্ট উৎসব পালন করে থাকে। এখনও অনেক গারো ঐতিহ্যবাহী "সাংসারেক" ধর্ম পালন করে থাকে। তাদের পূঁজনীয় বিভিন্ন দেব-দেবী আছে

Dhaka University Institutional Repository

যেমন- তাতারা রাবুগা, নাসতু, নোপান্তা, মাচি, সাজলং, চোরাবান্ডি, সুসিনি প্রভৃতি। উপাসককে বা পুরোহিতকে বলা হয় কামাল। গারোদের প্রধান উৎসবের নাম ওয়ানগালা। প্রধানত নতুন ফসল ঘরে তোলার সময় প্রধান উৎসব পালিত হয়। সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ফসলের কিছু অংশ উৎসর্গ করে থাকে। এই প্রবন্ধটি গারো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমী চিত্র তুলে ধরেছে। সে দিক থেকে এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের অতীত ইতিহাস, সামাজিক সংগঠনের ধরণ, বিশ্বাস ব্যবস্থা, জীবন যাপনের ধরন প্রভৃতি বিষয়গুলোকে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

Garo Community of Bangladesh, 2002

(Dr. S. Parvin)

ডঃ সিতারা পারভিন এর গবেষণা পত্র "বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠী" ২০০২ সালে "Essays on Garo Society, নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিসাবে তিনি গারো সমাজের জীবন প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক কাঠামো, ধর্ম, বিশ্বাস এবং মৌখিক ঐতিহ্যসমূহ। নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মান্দি নৃগোষ্ঠী (যেভাবে তারা পরিচিত হতে পছন্দ করে থাকে) যে ভাষায় কথা বলে তা ভাষাতাত্বিকভাবে টিবেটো-বার্মান থেকে উদ্ভুত, এবং এদের পূর্বপুরুষ মঙ্গোলিয়ান। তিনি বলেন গারো নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ব্যবস্থা মূলতঃ মাতৃতান্ত্রিক, তাদের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও ঐতিহ্য এবং বিবর্তনের নিজস্ব ধারা।

রাজনৈতিক সংযুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের আমলে গারোদেরকে অন্যায় এবং জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের ভূমি এবং বাড়ীঘর থেকে উৎখাত করা হয়েছে। এখনও তারা অনেক ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করছে। শুধু তাই নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিবাসীরা প্রায়ই তাদের সাথে খুবই সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রায়শঃই তারা দুর্ব্যবহারের সম্মুক্ষীন হয়। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন গারোদের মধ্যে থেকে অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরে আজও অনেক ক্ষেত্রেই তারা বহিরাগত হিসাবে বিবেচিত হয়।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন গারো শ্রমিকদের অবস্থাও বাংলাদেশে অন্যান্য শ্রমিকদের মত দূর্দশাগ্রস্থ। বর্তমানেও পেশাগত রাজনীতি এবং ব্যবসায় গারোদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। লিঙ্গ ভিত্তিক ভূমিকায় গারো মহিলারা (নকম) সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং গারো মহিলারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী, পরিবার এবং সমাজে তারা সম্মানের অধিকারী। স্বামী পরিবারে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে গ্রহণ করে থাকে। গারো মহিলারা খুবই পরিশ্রমী এবং আত্মনির্ভরশীল। তারা উপার্জনের জন্যে শহরমূখী হয় । আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ এবং খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ তাদের শহরে এসে

Dhaka University Institutional Repository

অকৃষিজ পেশা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সবশেষে তিনি বলেন সাংবিধানিকভাবে তাদেরকে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে বিশেষ মর্যাদা এবং অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। পরিশেষে তিনি অনুরোধ করেছেন গারোদের প্রতি পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য।

Garo Customary Laws of Inheritance and its Importance in Present Day, Global Content, 2002

(J.L.R Marak)

ডঃ জুলিয়াস এল.আর মারাক তাঁর এই প্রবন্ধের শুরুতে বলেছেন "আচিক মান্দি"রা মূলত মাতৃসূত্রীয় এবং মাতৃবংশীয় সমাজ যেখানে নারীর অবস্থান এবং মর্যাদা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাইতে অনেক বেশী উন্নত। সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে তিনি বলেন গারো সমাজ সংগঠিত মাতৃবংশীয় গোষ্ঠী দ্বারা যাদের 'মাচং' বলা হয়। 'মাচং' অর্থ 'মাতৃত্ব'। পুরুষ এবং নারী উভয়ই একসাথে পরিবারের কল্যাণের জন্য কাজ করে। সমগ্র গারো সমাজ কাঠামো তাদের সম্পদ একই মাচং এর মধ্যে সংরক্ষণ করার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা এই নীতিতে বিশ্বাস করে যে তাদের মনোনীত উত্তরাধিকার পরিচালক (মোকরোম) এবং সে হবে ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা) যে পরিবারের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। উত্তরাধিকার প্রশ্নে তিনি বলেন কোন পুরুষ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না এবং তাদের সম্পত্তি অর্জন ও অর্পনেরও কোন ক্ষমতা থাকে না। স্বামী অথবা বাবার কাজ হচ্ছে স্ত্রীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একজন মহিলাকে তার ব্যক্তির চেয়ে স্ত্রী, মাতা, এবং কন্যা হিসাবে অনেক বেশী সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছে। গারোদের একটি প্রথা রয়েছে যাকে কিম (Kim) বলা হয়। 'কিম' বন্ধনের অর্থ হলো বিবাহের মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তব্য পালন এর মধ্যে দিয়ে দু'টি মাচং এর মধ্যে আইনগত সম্পর্ক স্থাপন।

গারো সমাজ জীবনের পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের নতুন চ্যালেঞ্জসমূহ এখানে স্থান করে নিচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে আধুনিকায়ন এবং খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবকে উল্লেখ করেছেন। এই কারণসমূহ তাদের বংশধারা, উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ প্রথা, ভাষা, পোষাক, ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। তিনি মনে করেন গারো জনগোষ্ঠীর মূল নীতিমালা, ঐতিহ্য, আইন-কানুন, আনুষ্ঠানিকতা, ব্যবহারিকতা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের এটাই মোক্ষম সময়। তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যা হলো গারো মহিলারা শহরতলীতে তাদের গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং তাদের নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এবং ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে তিনি সমগ্র গারো জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের অস্তিত্ব-পরিচয় সংরক্ষণ এবং সমুন্নত রাখার আবেদন জানিয়েছেন। এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জানতে খুবই সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

Culture, Identity and Development: Expectation for the Next Millennium, 2002

(C. Richil)

লেখক ক্লিমেন্ট রিচিল তাঁর এই প্রবন্ধে সহজ এবং শৌখিনভাবে সংস্কৃতি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন। তিনি অত্যন্ত উদার এবং বিস্তৃতভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে সংস্কৃতি অর্থ মানুষের আদর্শগত বিশ্বাস, নৈতিক মনোভাব, আইন ও ভাষা, এবং সাধারণ কিছু মুহূর্ত, অস্ত্রসস্ত্র ও যন্ত্রপাতি। এরপর তিনি বলেন সংস্কৃতির পরিবর্তন মানে এর স্থিরতা বা এটা অনড় নয়, বরং এটা নিচু থেকে উঁচু স্তরে উন্নতি লাভ করে (যেমন খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতি থেকে বর্তমান সময়কাল)। গারো সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেন এটা মূলতঃ ত্রি-মাত্রিক; প্রধানত অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক কাঠামো এবং মানসিক অর্জন। অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে তিনি বলেন জুমচাষ অর্থনীতি, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা, সমাজ, রীতি-নীতি, প্রতিষ্ঠানসমূহ সবই মাতৃতান্ত্রিক আইনের অধীনে পরিচালিত। পুত্র এবং কন্যারা মাতৃবংশীয় পরিচয়ে পরিচিত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র কন্যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে।

তাঁর মতে খৃষ্টান পারিবারিক ধরণ গারো সমাজে প্রবেশ করেছে এবং বিস্তার লাভ করছে। খৃষ্ট ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে এর প্রভাব গারো সমাজকে প্রভাবিত করেছে। পরিশেষে গারোদের মানসিক সম্পদ বলতে তিনি বলতে চেয়েছেন গারোরা বর্তমানে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে, খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে বিভিন্ন রকম সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা এবং সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছে। সেই সাথে তারা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রীতি-নীতিকে অনুসরন করছে, আবার একই সাথে মাতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতায় প্রগতিশীল রীতি-নীতি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রহণ করছে।

পরবর্তী শতাব্দীর প্রত্যাশা সম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা দেখছি গারো অভিভাবকরা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই সম্পত্তির অংশ দিচ্ছে। পারিবারিক সম্পত্তির অংশ ছেলেদের দেয়ার অর্থ হচ্ছে পুরুষ মালিকানা মহিলা মালিকানার স্থানে ক্রমশ বিকাশ লাভ করছে। সম্পত্তি মহিলা নিয়ন্ত্রণ থেকে পুরুষ নিয়ন্ত্রণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ গারো খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ গারো সমাজের বর্তমান প্রবনতা নির্দেশক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

গবেষণা পদ্ধতি

গারো জনগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে। গারো গ্রামীণ সমাজ কাঠামো অত্যন্ত দৃঢ় বুননে আবদ্ধ। বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে নেত্রকোণা জেলার গারো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি গ্রামে। এই গ্রামটি বাংলাদেশের মূল সামাজিক জীবনের সাথে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। নেত্রকোণা জেলায় মোট ২২৯৯ টি গ্রাম রয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ডায়রী, ২০০১)। এর মধ্যে অল্প সংখ্যক গ্রামে গারো নৃগোষ্ঠীর বসবাস। এ লক্ষ্যে আমার প্রথম কাজ ছিল যেসব গ্রামগুলোতে গারো জনগোষ্ঠী বসবাস করে সে গ্রামগুলোর তালিকা খুঁজে বের করা। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এবং উপজেলা পরিষদের আদিবাসী কল্যাণ সংঘের সাহায্যে আদিবাসীরা বসবাস করে এরকম ১৪টি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়। সংখ্যাগতভাবে এই গ্রামে বেশী সংখ্যক গারো গৃহস্থালী আছে।

২.১। গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি একটি মানবজাতির বিবরণ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র পরিসরের গবেষণা যেখানে আলোকপাত করা হয়েছে "গারো" নামক একটি নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন, বিশেষ করে বলতে গেলে তাদের জীবন-যাপনের ধরণ এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামাজিক পরিবর্তনসমূহকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। সমস্যার ধরণ এবং প্রকরণকে বিবেচনা করে একটি শিথিল গবেষণা পদ্ধতিতে কিছু পদ্ধতি এবং কৌশল নৃবৈজ্ঞানিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণাটি পরিচালনা করার সময় যত বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল চাবিকাঠি হিসাবে এখানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Participant observation) অনুসরন করা হয়েছে।

২.২। গবেষণা নক্শা

বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে এথনোগ্রাফিক তত্ত্ব এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুণবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা নক্শাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে গবেষণা নক্শার এ ভাগ দু'টির আলোচনা করা হলো।

২.২.১। সংখ্যাগত প্রস্তাবসমূহ

এটা তথ্য সংগ্রহের একটি কৌশল যেখানে পরিসংখ্যানগত অবস্থান আমাদের তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস, তুলনামূলক বিচার এবং পরিমাপণ করতে সহায়তা করে থাকে। এটা কিছু সংখ্যাগত

Dhaka University Institutional Repository

প্রপঞ্চসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। পরিসংখ্যানগত কৌশল দু'টি পৃথক সামাজিক প্রপঞ্চের সম্পর্কে দিক নির্ধারণী তথ্য উন্মোচন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। এতে আছে অনেক সহজ, প্রয়োজনীয়, তথ্য স্থানান্তর এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন পরিমাপ সমূহের পরিসংখ্যান কৌশল যেমন-সারণিকরন, শ্রেণীবদ্ধকরন, জরীপ প্রভৃতি। এই কৌশলগুলো বিশেষভাবে এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। এটা হলো তথ্যের সংখ্যাগত উপস্থাপন।

২.২.২। গুনগত প্রস্তাবসমূহ

গুনগত তথ্যের সমাহার বিশেষণ এবং ধারণা পদ্ধতিগতভাবে প্রপঞ্চসমূহ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। গুনগত বিশ্লেষণ শুরু হয় মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে যাওয়ার আগে এবং ক্রমাগত চলতে থাকে প্রাপ্ত ধারণাকে পর্যবেক্ষণের পরীক্ষণ, পরিবর্তন সাধন এবং পরিবর্ধন করা পর্যন্ত। সব ধরনের অসংখ্যাবাচক প্রপঞ্চ এবং তথ্যসমূহ গুনগত বিশ্লেষণের অধীন। এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরণ, সামাজিক অবস্থা, বিশ্বাস ব্যবস্থা, পরিবর্তনের ধরন, সামাজিক জরীপ পদ্ধতিতে তথ্য সারণীবদ্ধকরণ এবং রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি কাজ করা যায়। সামাজিক জরীপ পদ্ধতিতে এইসব কৌশলগুলো ব্যবহৃত হয়। সাধারণত উন্মুক্ত জরীপে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সাহায্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্দীপনমূলক গবেষণা (action research) পরিচালনা করে। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামাজিক জরীপ পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সবসময়ই এক বা একাধিক গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে, যা গবেষক তার গবেষণায় পদ্ধতিগতভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। বাস্তব দৃষ্টিতে মনে হয় আসলে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন নির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কৌশল নেই। কিছু নৃবৈজ্ঞানিক কৌশল আছে যা সাধারণত তত্ত্বীয়ভাবে ব্যবহার করা যায় না। এই পদ্ধতিগুলো সাধারণত বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ব্যবহার করা হয়।

২.৩। স্থান নির্বাচন

নেত্রকোণা জেলায় গারো নৃগোষ্ঠী বসবাসরত গ্রামগুলোকে চিহ্নিত করার পর বর্তমান গবেষণার জন্য উৎরাইল গ্রামটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। নীচে এই গ্রামটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: এই গ্রামটিতে মিশ্রভাবে গারো নৃগোষ্ঠীর সাথে সাথে মুসলিম এবং হিন্দু অধিবাসী বসবাস করে।

দ্বিতীয়ত: যেসব গ্রামগুলোতে গারো জনগোষ্ঠী বসবাস করে সেসব গ্রামগুলোর মধ্যে এই গ্রামটিতেই অধিক সংখ্যক গারো গৃহস্থালী আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ এই গ্রামটি শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

চতুর্থতঃ এই গ্রামের একটা অংশ পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত।

পঞ্চমতঃ সমগ্র নেত্রকোণা জেলায় যে তিনজন সাংসারেক গারো আছে তারা এই গ্রামের অধিবাসী।

ষষ্ঠতঃ সুদূর অতীত থেকে গারো জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে এই গ্রামে বসবাস করছে।

সপ্তমতঃ এই গ্রামে দু'টি খৃষ্টীয় চার্চ আছে। একটি ক্যাথলিক এবং অন্যটি প্রোটেষ্টান। এই চার্চ দু'টি সমগ্র গ্রাম এবং নিকটবর্তী গ্রাম সমূহেরও সকল কর্মকান্ডের উৎস।

অষ্টমতঃ এই গ্রামটিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আছে, যেমন-বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, হাসপাতাল, ইত্যাদি।

নবমতঃ এই গ্রামে পোষ্ট অফিস এবং টেলিফোন সুবিধা আছে।

দশমতঃ উৎরাইল গ্রামে একটি বাজার আছে যাকে স্থানীয়ভাবে গারো বাজার বলা হয়। এই বাজারটি গারো এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানবিক ও সামাজিক পারস্পরিক বিনিময়ের একটি স্থানে পরিণত হয়েছে।

একাদশঃ এই গ্রামে একটি মিশনারী স্কুল আছে যা অত্যন্ত পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী। এখানে গারো ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বাঙ্গালীরাও অধ্যয়ন করে থাকে।

এই গ্রামের মোট গৃহস্থালীর সংখ্যা ১২৩টি। এর মধ্যে ২টি মুসলিম গৃহস্থালী, ৪টি হিন্দু গৃহস্থালী এবং ৩টি খৃষ্টান মিশনারীদের এবং গারো গৃহস্থালীর সংখ্যা ১১৪টি (উৎসঃ মাঠ পর্যবেক্ষণ, ২০০৫)। বর্তমান গবেষণার জন্য গারো গৃহস্থালী প্রধানদের নির্বাচিত বিষয়ের উত্তরদাতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নমুনায়নের পরে ৫৭ জন ব্যক্তিকে উত্তরদাতা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৪৩ জন পুরুষ এবং ১৪ জন মহিলা।

২.৪। ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

মানব বিজ্ঞানীদের গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে জানা। বিবর্তনবাদী ধারণা নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান চর্চার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব বিজ্ঞানীদের গবেষণার জগৎও বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কল্পনা কিংবা অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে কোন কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ও সমাজ বিজ্ঞানীগণ মানব সমাজের বিভিন্ন রূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পেলেও তারা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ তথা ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে যথার্থ তথ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। বিবর্তনবাদী ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপরই তৎকালীন নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে Engerton & Langness এর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "This was mostly "Armchair" theoring, few of the theorist, had firsthand knowledge of other people. For too much reliance

Dhaka University Institutional Repository

was placed on the accounts frequently biased and distorted of early travelers, journals and missionaries" (Engerton & Langness, 1967:2)।

সংস্কৃতির গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীগণ প্রধানত ৫টি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতিমালার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের মতে "সংস্কৃতি বা মানব সংস্কৃতি" গবেষণার মৌলিক ভিত্তিই হচ্ছে এই সব নীতিমালা। গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্ব থেকে শুরু করে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করা পর্যন্ত এইসব নীতিমালা মেনে চলতে হয়। নীচে মানব বিজ্ঞানের গবেষণার মৌলিক নীতিমালাগুলো উল্লেখ করা হল:

১। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Holistic View);

২। ক্ষেত্র গবেষণা (Fieldwork);

৩। সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা (Cultural Relativism);

৪। তাত্ত্বিক ধারণা গঠণ (Theoretical Concept Building);

৫। তুলনামূলক বিশ্লেষণ বা বহু সংস্কৃতির পর্যালোচনা (Comparative Analysis/ Cross-cultural Analysis)

(চৌধুরী ও রশীদ, ১৯৯৫, ৫৩)

সব ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাত্ত্বিক (pure academic) এবং কর্মেদ্দীপনামূলক (actain-oriented) গবেষণা যাই হোক না কেন, গবেষণা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব সমাজ এবং সাংস্কৃতিক গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত চার ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি (empirical methods) ব্যবহৃত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বাস্তব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এই গবেষণায় ব্যবহৃত অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১। নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি;

২। কেসষ্টাডি;

৩। জরীপ পদ্ধদি; এবং

৪। পরিসংখ্যান পদ্ধতি

এর মধ্যে নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কেসষ্টাডি পদ্ধতিকে গুনবাচক পদ্ধতি বলা হয়। জরীপ পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। নৃবৈজ্ঞানিক এবং কেসষ্টাডি পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষককে মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এরপর তিনি প্রশ্নমালা (check-list) তৈরী করেন, তথ্যদাতা বা উত্তরদাতাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন (rapport building), নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা (focus group discussion) ইত্যাদি করেন। এই কৌশলগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে গবেষক একটি সমাজের একটি চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

আঁকেন, যেখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তার উদ্দেশ্যমূলক বিষয়টি। এই পদ্ধতিসমূহকে গুনবাচক পদ্ধতি বলা হয়। গুনবাচক পদ্ধতির, বিশেষত নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির, ব্যবহার বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে শুরু হয়েছে। আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী পিটার জে বার্টোসী এবং বাংলাদেশী নৃবিজ্ঞানী আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ৬০ এবং ৭০ এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক গবেষক মনে করেন নৃবৈজ্ঞানীক পদ্ধতির উপযোগীতা সর্বাধিক। নৃবৈজ্ঞানীক পদ্ধতির অনুসরণ করলে অনেক বেশী বিষয় সম্পৃক্ত তথ্য পাওয়া যায়, এখন এটা প্রমাণিত। এমনকি তা যদি বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর ওপর হয় তাতেও একই ফলাফল বহন করে। এজন্য মনে করা হচ্ছে যে নৃবৈজ্ঞানীক পদ্ধতির ব্যবহার গবেষণায় সবচেয়ে বেশী উপযোগী। নৃবিজ্ঞানী Petri J. Pello (1970) এর মতে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ (Participant Observation);
২। জীবন ইতিহাস সংগ্রহ (Collection of Life History);
৩। কাঠামোগত সাক্ষাৎকার (Structural Interview);
৪। প্রশ্নমালা (Questionnaire);
৫। শ্রেণীকরণ এবং সারণীবদ্ধকরন (Ratings and Rankings);
৬। শব্দার্থতাত্ত্বিক বিভিন্ন কৌশল (The Scenantic Different Technique);
৭। পরিকল্পনা পরিমাপন (Project Measures);
৮। অন্যান্য মনোবৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (Other Psychological Instrument);
৯। অনতিলক্ষ্য পরিমাপণ (Unobtrusive Measures);
১০। মাঠ পর্যায়ের প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি (Technical Equipment in Fieldwork);
১১। বহুমুখী যান্ত্রিক গবেষণা (Multi Instrument Research); এবং
১২। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদাণকারী ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (Key-informent Interviewing)।
(Pello, 1970)

বর্তমান গবেষণাটি অনুসন্ধান এবং বর্ণনামূলক প্রকৃতির হওয়ায় গুণগত এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক উভয় ধরনের কৌশল এখানে সংযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এই গ্রামটিতে গৃহস্থালি প্রধানদের ওপর বিভিন্ন মাত্রায় সামাজিক জরীপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালনা করার সময় আমি সরাসরি এই গ্রামের গ্রহস্থালিতে গিয়ে অধিবাসীদের সাথে কথা বলেছি। আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার পর তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছে সব রকমের সহযোগিতা তারা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণাটি সম্পাদন করতে সময় লেগেছে ৩ বৎসর ২ মাস। এর মধ্যে আমি ১০ মাস মাঠে অবস্থান করেছি। ২০০৪ সনের ১২ মার্চে আমি মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করি। কিন্তু আমি একসাথে এই সময় মাঠে অবস্থান করতে পারিনি, বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে আমি মোট ১০ মাস মাঠ অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছি। আমি প্রতিদিন সকাল ৯টায় মাঠে যেতাম এবং দুপুর ১টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতাম। দুপুরের খাবার-সম্পন্ন করে, আমি আবার ৪টার সময় মাঠে যেতাম এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টা বা কখনও রাতেও অবস্থান করতাম। আমি জেলা পরিষদ বাংলোতে অবস্থান করতাম। এই বাংলোটি সোমেশ্বরী নদীর অপর পারে হওয়ায় সবসময়ই নদী পার হয়ে আমার গবেষণার জন্য নির্বাচিত গ্রামে যেতে হতো। অনেক সময় যদি আবহাওয়া প্রতিকূল থাকত তখন নদী পার হওয়া খুবই কঠিন হয়ে যেত। প্রায়শ:ই আমি একটি গারো পরিবারের সাথে অবস্থান করেছি, বিশেষত উৎসব এবং অনুষ্ঠানের সময়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় এই গবেষণাটিতে আংশিক কাঠামোগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সু-গভীরভাবে কৌশলগুলো ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কৌশল ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণার প্রথম পর্যায়ে গ্রাম নির্বাচন এবং উত্তরদাতা হিসাবে গৃহস্থালি প্রধানদের তালিকা তৈরী করার দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। অতঃপর গৌণ তথ্যের উৎস হিসাবে জেলা এবং উপজেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করার পাশাপাশি এবং গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রাম এবং গৃহস্থালী প্রধানদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এখানে অর্ধ-কাঠামোগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরদাতের কাছ থেকে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। গবেষণার তৃতীয় পর্যায় নিবেদিত করা হয়েছে গারো সমাজের বিশ্বাস ব্যবস্থা, আনুষ্ঠানিকতা, বর্হিবিশ্বের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার প্রকৃতিগত বিশ্লেষণে। অনুসন্ধানের সময়কালে সময়, স্থান এবং প্রয়োজনে অনুসারে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং অবস্থান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্যের ভিত্তিতে এখানে ভৌগলিক অবস্থার এবং সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গারোদের জীবন-যাপন পদ্ধতি গভীরভাবে(diachronic) এবং স্বজাতিত্ব (Synchornic) এই উভয় প্রক্রিয়ায় সমন্বিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাত্ত্বিকভাবে উচ্চতর কার্যকাঠামো ব্যবহার ব্যতিরেকে সমন্বিতভাবে দীর্ঘস্থায়ী, গভীর এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে বাস্তব উপযোগীতার ওপর ভিত্তি করে। এখানে উভয় পদ্ধতি একই পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতামূলক এবং ব্যবহারযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বিবর্তনবাদ এবং ব্যাপ্তিবাদ যৌথভাবে গ্রহণ করা হয়। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিবর্তনবাদ হচ্ছে সময়ে সাথে সাথে সাংস্কৃতিক জটিল ক্রমবিকাশ। ব্যপ্তিবাদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতিগত ধারণার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যাপ্তিকে বুঝায় এরা সবসময়ই প্রতিযোগিতামূলক, কারণ এই তত্ত্বগুলি সংস্কৃতিগত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন ধারণাটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় মূলত: উভয় তত্ত্ব এটাই ব্যাখ্যা করে থাকে। এখনও এই তত্ত্ব দু'টি একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন তত্ত্বের অংশ। সঙ্কালন বা সমলয় প্রস্তাবনার অন্তর্গত তত্ত্ব হচ্ছে ক্রিয়াবাদ, কাঠামোবাদ, ব্যাখ্যাবাদ এবং অন্যান্য যা সময়ের নির্দেশনা ব্যতিরেকে একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকে। বর্তমান গবেষণাটির প্রেক্ষাপটে বলা যায় দীর্ঘস্থায়ীত্ব এবং সঙ্কালন দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ের ব্যবহারই এই গ্রামের গারো জনগোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণের জন্য যথার্থ বলে মনে করা হয়েছে। বিষয় সম্পর্কিত তথ্য অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সাহায্যে একটি জরীপ করা হয়েছে। এটা ছিল মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের একটি সম্পূরক। প্রশ্নমালা পূরণ করার জন্য মাঠে দীর্ঘ সময় গ্রহণ করা হয়েছিল। কিছু কিছু নির্দিষ্ট নির্বাচিত বাড়ীতে আমি অনেক সময় গল্প করে সময় অতিবাহিত করেছি এবং প্রশ্নমালা পূরণ করেছি। আমি তাদের সাথে গভীরভাবে মিশেছি এবং মাঝে মাঝে তাদের অনুভূতির সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছি। গবেষণার সমস্যার ধরণ এবং প্রকরণ বিবেচনা করে একটি শিথিল পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য সমন্বিতভাবে কয়েকটি গবেষণা কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। গভীর পর্যবেক্ষণ, অবস্থানমূলক অংশ গ্রহণ, সম্পর্ক তৈরী প্রভৃতি পদ্ধতিগুলো এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রমে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীর সাথে অনানুষ্ঠানিকভাবে বহুবার বহু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পূরক তথ্য হিসাবে কিছু কেসস্টাডি করা হয়েছে। একটা সুগঠিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে ডায়েরী ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা সম্পৃক্ত আরও প্রানবন্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ক্যামেরা (স্থিরচিত্র) ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৫। নমুনায়ন পদ্ধতি

একটি উপযোগী নক্শা সূত্রবদ্ধ করার পর প্রত্যেক গবেষককে অবশ্যই চিন্তা করতে হয় মূল গবেষণার বিষয়ে সম্পৃক্ততার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায় এবং তার পদ্ধতি কি হবে। প্রতিটি বিষয় আদর্শগতভাবে গবেষণার সাথে সংযুক্ত। কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে পৃথকভাবে এবং এক এক করে অন্তর্ভূক্ত করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। এ কারণে এর ব্যবহার সাধারণত উৎসাহিত করা হয় না। অতএব, সমগ্র গোষ্ঠি থেকে একটি প্রতিনিধিত্বশীর সংক্ষিপ্ত গোষ্ঠি নমুনায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে নমুনায়ন হিসাবে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন (Systematic random sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তি নিয়ে দৈবচয়িত পন্থায় নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়িত নমুনা বলে। নিয়মতান্ত্রিক নমুনায়নে সম্পর্কের প্রতিটি এককে একটি সুনির্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। সম্পর্ককে সাজানোর ভিত্তি হিসেবে ভৌগলিক, আক্ষরিক অথবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়। তারপর নমুনা-ব্যাপ্তি (sampling interval) নির্ধারন করা হয়। নমুনা ব্যাপ্তির আয়তন সমগ্র এবং নমুনা আয়তনের ওপর নির্ভর করে। এই গ্রামে ১২৩টি গৃহস্থালী রয়েছে। এর মধ্যে ১১৪টি গারো গৃহস্থালী, ৩টি খ্রিষ্টান, ৪টি হিন্দু এবং ২১টি মুসলিম গৃহস্থালী। এখানে সমগ্রক হিসাবে ১১৪টি গারো গৃহস্থালীকে বিবেচনা করা হয়েছে। নমুনার আয়তন ৫৭।

সূত্র অনুসারে $\frac{N}{n} = K,$

$\frac{১১৪}{৫৭} = ২$

সুতারাং, K =2 হচ্ছে নমুনার ব্যাপ্তি।

১১৪টি গারো গৃহস্থালী প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি গৃহস্থালী শুমারী করা হয়। এই গ্রামে অবস্থিত ওয়াই এম.সি.এ (Y.M.C.A) রেষ্ট হাউজের ঠিক পিছনের গৃহস্থালী থেকে জরীপ শুরু করা হয়েছে। অবাধ দৈবচয়িত প্রক্রিয়ায় প্রথম গৃহস্থালিটি নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর বা দিকে একটা করে গৃহস্থালী বাদ দিয়ে আরেকটা এভাবে সমগ্র গ্রামের গৃহস্থালীকে নমুনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। নমুনার ব্যাপ্তি হচ্ছে ২। অর্থাৎ প্রতি ২টি গৃহস্থালী থেকে ১টি করে নমুনায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে এবং নমুনার আয়তন হচ্ছে ৫৭। অর্থাৎ সমগ্র গ্রাম থেকে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়িত নমুনায়নের মাধ্যমে তথ্যাদাতা হিসাবে নমুনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই ৫৭ জন গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে ৪৩ জন পুরুষ এবং ১৪ জন মহিলা। নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতির কিছু বিশেষ সুবিধাজনক দিক রয়েছে। এতে দৈবচয়ন পদ্ধতির চেয়ে আরও উন্নতিভাবে সমস্ত সংগ্রাহককে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সময় এবং খরচ উভয়ই সাশ্রয় করা যায়। আমি মনে করেছি এই গবেষণাটির জন্য নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে উপযোগী।

কেসস্টাডির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা (purposive sample)। গুড এবং হাট এ সম্পর্কে বলেন "এটা সবচেয়ে ব্যবহার এবং জনপ্রিয় একটি নমুনায়ন পদ্ধতি" (গুড ও হাট, ১৯৫২: ২৩০)। এই গবেষণায় উত্তরদাতা হিসাবে যে ৫৭ জন গৃহস্থালী প্রধানকে নির্বাচন করা হয়েছে তাদের প্রতিটি সামাজিক শ্রেণী থেকে একজন করে কেসষ্টাডির জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন সাশ্রয়ী বলে এই পদ্ধতিটি এই গবেষণাটিতে গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবসম্মতভাবে উদ্দেশ্যকে অপরিবর্তীত এবং তড়িৎ করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ সফলতা আছে। এই গবেষণাটিতে উদ্দেশ্যমূলক বিষয় (ব্যক্তি) হিসাবে ৫ জনকে গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪জন মহিলা ও ১ জন পুরুষ ।

২.৬। তথ্য সংগ্রহ কৌশল

প্রতিটি গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহ কৌশল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই গবেষণাটিতে বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। যথা-

১। মুখ্য উৎস এবং

২। গৌণ উৎস

২.৬.১। মুখ্য উৎস

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সরাসরি গারো জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে যা প্রাথমিক উৎস। সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ব্যক্তিগত জরীপ, পর্যবেক্ষণ, কেসষ্টাডি, জীবন ইতিহাস, এবং মৌলিক ইতিহাসের মাধ্যমে এটি সম্পাদিত হয়েছে যা প্রাথমিক উৎস হিসাবে চিহ্নিত। প্রতিটি গৃহস্থালী একক এবং প্রতিটি উত্তরদাতার কাছ থেকে সরাসরি তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে নিবিড়ভাবে ক্ষেত্র অবস্থানে তথ্যদাতাদের সাথে কথোপোথন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, যা ছিল প্রায় অধিকাংশ তথ্যের সংগ্রহ পদ্ধতি। অতএব, গবেষণায় ব্যবহৃত বেশীরভাগ তথ্যই প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত এবং নির্ভরযোগ্য। তথ্যসমূহকে আরও অধিক যথার্থতা যাচাই এবং গুরুত্ব অনুধাবন করে গবেষণার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২.৬.২। গৌণ উৎস:

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তথ্যের গৌণ উৎস হিসাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরীপ এর বিভিন্ন রিপোর্ট, থানা সদর দফতরের কিছু নথীপত্র, প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের মাধ্যমিক উৎসগুলোও ছিল যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।

২.৬.৩। সুগভীর পর্যবেক্ষণ

গভীর পর্যবেক্ষণের তৃতীয় ধাপটি এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় সুগভীর পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। দূরুহএবং গোপনীয় বিষয়সমূহ যথাসাধ্যভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অপ্রকাশিত বিষয়সমূহ বিভিন্ন পরিস্থিতি অবলোকনের মাধ্যমে উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

২.৬.৪।প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণাটিতে যে সব পদ্ধতি এবং কৌশল বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হয়েছে তার পূর্বশর্তই হচ্ছে অবস্থান পর্যবেক্ষণ। এটাই হচ্ছে প্রধান গবেষণা পদ্ধতি যার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ অগ্রসর হয়েছে। একটি সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরী করার জন্য সুবিধাজনকভাবে অবস্থান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ কিছু দিক থেকে সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে আলাদা। অবস্থান পর্যবেক্ষণ কিছু গুনগত মান ধরে রাখতে সক্ষম যা সাধারণ পর্যবেক্ষণে সম্ভব নয়। যেমন দৈব্য অভিষ্ট লক্ষ, গভীর সচেতনতা, প্রশস্ত দৃষ্টিকোণ, আভ্যন্তরীন এবং বহি, অভিজ্ঞতা, অর্ন্তবীক্ষণ, প্রমান সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ের অবস্থাতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে অবস্থান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। একটি সামাজিক অবস্থাকে সযসময় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি (actor), কার্যকলাপ (activities), এবং স্থান (place) এর উপর নির্ভরশীর হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জাতিতাত্ত্বিক প্রস্তাবনায় পর্যবেক্ষণ খুবই ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। নিচে চিত্র:১-এ অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, কার্যকলাপ এবং সময়/স্থান এর মধ্যকার সম্পর্কের দিক তুলে ধরা হলো যা সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সম্পার্কিত বিবেচ্য বিষয়সমূহকে বুঝতে সহায়তা করে।

চিত্র-১: সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ।

চিত্র-১ এ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি হচ্ছেন গবেষক। তিনি নির্ধারিত বিষয়ের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে গবেষনার সময়কাল এবং যে স্থানে গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে সে স্থান। সামাজিক অবস্থা সময়ভেদে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারকে নির্দেশ করে। এছাড়া গবেষণার উদ্দেশ্য বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারকে অনেকসময়ই বাধ্যবাধকতায় পরিণত করে।

Dhaka University Institutional Repository

এমনোগ্রাফিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা নীচের চিত্রটিতে লক্ষ করি।

চিত্র- ২ তিন প্রকার পর্যবেক্ষণ এর সাথে পর্যবেক্ষণ সময়ের সম্পর্ক।

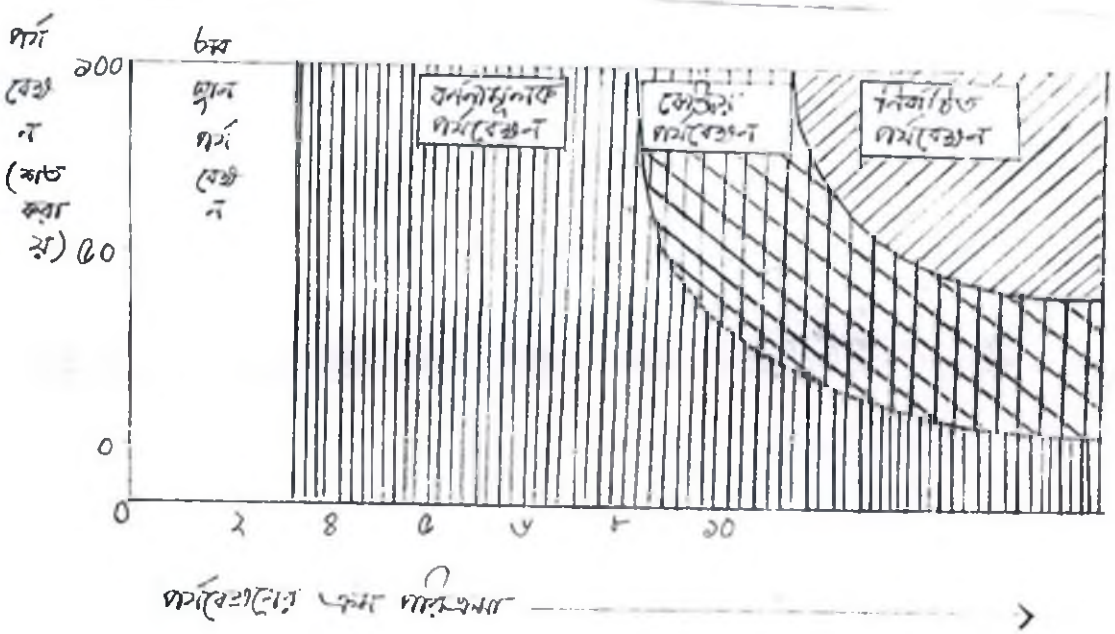

চিত্র-২ এ গবেষণায় ব্যবহৃত তিন প্রকারের পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিন ধরনের পর্যবেক্ষণের মধ্যে বর্ণনামূলক পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে বেশী সময় ব্যয় করা হয়েছে।

২.৬.৫। তথ্য সংগ্রহের অন্যান্য কৌশল

এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধান ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে অবস্থান পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এছাড়াও এই পদ্ধতিকে প্রধান উপজীব্য করে অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে আর্থ-সামাজিক জরীপ, প্রশ্নমালা, স্থিরচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতি।

২.৬.৬। তথ্যের গৌণ উৎস সমূহ

কিছু প্রকাশিত উপরণ এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকাশিত বিভিন্ন উপকরণ যেমন সংবাদপত্র, বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্ট, সামাজিক গবেষণার জার্নালসমূহ তথ্যের গৌণ উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো পরোক্ষভাবে তথ্যের গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার যথেষ্ট কম করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বল্প সংখ্যক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র বর্তমান গবেষণার সামাজিক সমস্যাকে প্রকৃতভাবে চিহ্নিত এবং অনুধাবন করার জন্য। এই সবকিছুই সমগ্র পরিস্থিতিকে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে বোঝার জন্য এবং তথ্যের আরও উন্নততর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার প্রকৃতি নির্বাচন করার পর উদ্দেশ্যকে কার্যকারী করার জন্য আনুষ্ঠানিক সাধনপত্র গঠন এবং এর পরবর্তীতে উত্তরদাতাদের নমুনায়ন করা হয়েছে, প্রথমত: পর্যবেক্ষণপূর্ব, এবং দ্বিতীয়ত: মূল গবেষণা কাল। অর্থাৎ গারো জীবনের অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতি। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে আসল তথ্য জানার আগে গবেষণা কার্যক্রমের অনুষ্ঠানটি সাধন কার্যক্রম (instrument word) এবং এর নক্শা উত্তরদাতাদের জন্য যথাযথ কিনা তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে একটি প্রশ্নমালা গঠণ করা হয়েছে। প্রশ্নমালার একটা নমুনা প্রথমে যাচাই করা হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। এরপর মূল প্রশ্নমালা গঠণ করা হয়েছে। যাহোক, যে সব বিশেষ দিক এই গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো হলো-

১. গারো জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক জনসংখ্যাতত্ত্ব;
২. গারো জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক অবস্থা; এবং
৩. গারো জনগোষ্ঠীর অবকাঠামোর তুলনামূলক অবস্থা।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে তথ্য সংগ্রহের সময় অনেক উত্তরদাতাই প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে অস্বস্তি বোধ করেছেন। তারা অনেকেই গবেষককে কোন সরকারী কর্মচারী মনে করে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এ কারণে গবেষকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পরিচিতিমূলক সনদপত্র বা প্রামানিক কাগজপত্র উত্তরদাতাতের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.৭। তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল সমূহ

তথ্য সংগ্রহের পর আর একটি দাবী গবেষককে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় তা হচ্ছে অশোধিত তথ্যসমূহকে সংগঠিত করা। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পর অশোধিত তথ্য সমূহকে এমন একটি আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যা বিশ্লেষণযোগ্য। এরপর তথ্য বিশ্লেষণের উপযুক্ত কৌশল নির্ণয়ের চেষ্টা করা । যে সব তথ্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে গৃহীত হয় তা সাধারণত যে কোন অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণের পূর্বে বিশেষভাবে সংগঠিত করা হয়। এরপর প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট নীতিমালায় বিভক্ত করা এবং যন্ত্রে ব্যবহার উপযোগী করা অর্থাৎ কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী করা যা সাধারণভাবে সবার জন্য বোধগম্য হয়। পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের আগে গৃহীত তথ্যসমূহকে কম্পিউটারে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি গবেষককে সংগৃহীত তথ্য সমূহকে একটি নীতিমালায় স্থানান্তর এবং রুপান্তর করতে হয়। প্রায়শ:ই এই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময়ক্ষেপন করে। পরবর্তীতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণাটিতে তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত করা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য এই সকল প্রতিটি পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় গৃহীত তথ্য সমূহকে এস,পি,এস,এস (SPSS) প্রোগ্রাম এর সাহায্যে কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণায় কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যা বর্ণনামূলক। এর পরিপ্রেক্ষিতে একক চলক (variable) এর ওপর ভিত্তি করে তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে অধিকাংশ চলকের পরিমাপের বিরতি হচ্ছে নমিনাল (nominal) এবং মাত্রা ব্যবধানে। এই গবেষণার পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ, গঠনসংখ্যা বন্টন এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রবন্ধ সমূহকে আরও অধিকতর ভালভাবে বোঝার জন্য শতকরায় প্রকাশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমত: সাধারণভাবে গারো সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং ভৌগলিক অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: গারো জনগোষ্ঠীর পরিচিতিমূলক আচরণ, গৃহস্থালী সমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যা সংগৃহীত এই গ্রামের গৃহস্থালী প্রধানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন মন্তব্য, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনার মাধ্যমে মূলত: তাদের প্রতিক্রিয়াসমূহ সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ত: সাক্ষাৎকারের সময় কিছু কাঠামোগত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে গারোদের সাধারণ বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, বিশ্বাস ব্যবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তালিকা, বর্ণনা এবং অন্যান্য তথ্য যা এই গবেষণা থেকে পুনরুৎপাদিত হয়েছে তা মূলত: প্রাথমিকভাবে সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং অবস্থান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমূহের উত্তর প্রতিক্রিয়ার বিষয়বস্তু এবং উল্লেখযোগ্য অংশ।

বর্তমান গবেষণাটি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণবর্ণনামূলক (exploratory-cum-descriptive) প্রকৃতির। বিশ্লেষণ এর আলোকে গবেষণাটিকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত: গারো জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সমাজকাঠামো এবং আচরণগত পরিবর্তন ও রুপান্তর প্রক্রিয়ার বর্ণনা, এবং দ্বিতীয়ত: গারোদের বিচ্ছিন্নকরণের সম্পর্কে চাপ এর সংসৃষ্টকরণ এবং বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের সাথে আত্মীকরণ।

বর্তমান গবেষণাটি এর সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষুদ্র পরিসরে গারো সমাজব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতায় কোন ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ তা তাত্ত্বিক সাধারনীকরণ দাবী করে না। এখানে শুধু গারো সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সমূহ সাধিত হয়েছে এবং আসন্ন যে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়েছে তাই উল্লেখিত হয়েছে। বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর পরিবর্তন এবং এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত গবেষণাকর্মে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রসরতা সাধিত হয়েছে।

২.৮। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা

এই গবেষণাটি এম.ফিল থিসিস এর একটি অংশ। সমগ্র মাঠ পর্যায়ের সময়কালে পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে শুরু করে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত একজন গবেষক হিসাবে আমি বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। এরমধ্যে কিছু কিছু সমস্যা আছে যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেরকম কিছু সমস্যা উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

হলো। উত্তরদাতাগণ বেশী সময় দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ যখন আমি প্রশ্নমালা পূরণের জন্য সময় নিচ্ছিলাম উত্তরদাতাগণ প্রায়ই অসহযোগীতা, তাড়াহুড়া, এবং অন্যান্য বিরক্তিসূচক আচরণ প্রকাশ করতো। গৃহস্থালী প্রধানের সাথে দেখা করাও সহজসাধ্য ছিল না। এক একজন গৃহস্থালী প্রধানের সাক্ষাৎ পেতে আমাকে বেশ কয়েকবার তার গৃহস্থালীতে যেতে হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট ধৈর্য্য এবং সময় নিয়ে গৃহস্থালী প্রধানদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। বহুবার আমাকে তাদের গৃহস্থালীতে যেতে হয়েছে। গৃহস্থালী প্রধানরা তাদের আয় এবং সঞ্চয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেন নাই বলে আমার মনে হয়েছে। অনেকেই মনে করেছেন আমি সরকারী কোন কর্মকর্তা যে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছে।

এছাড়া অনেকেই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। তারা আরও জানতে চেয়েছেন এর ফলাফল কি হবে, এটা কি কোন এন.জি.ও এর পক্ষে গবেষণা, নাকি কোন প্রজেক্টের কাজ ইত্যাদি।

কিন্তু যখন থেকে এখানকার মানুষ গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, তখন থেকে তারা বেশ আগ্রহের সাথে আমাকে তথ্য দিয়েছে। কিন্তু এরপর আবারও উত্তরদাতাগণ তাদের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছে এবং কথা বলতে চায় নাই। এ পর্যায়ে গবেষণাটি আমার কাছে একঘেয়ে এবং নিরানন্দ মনে হয়েছে। এইসব দু:খজনক অধ্যায় ছাড়া আরও বেশ কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্ত ছিল এই গবেষণাকালে যা আমাকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছে। গ্রামবাসীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পর তারা প্রায় সবাই আমাকে আপ্যায়িত করার চেষ্টা করত। অনেকেই আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস এবং আপন মনে করে তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা প্রকাশ করত। কিছুদিন এখানে অবস্থান করার পর গ্রামবাসীরা যখন আমাকে তথ্য দিতে শুরু করল তখন আমার কাছে তা আনন্দের ছিল। এ পর্যায়ে গবেষণাটির মাঠকর্ম আমি উপভোগ করেছি। বিভিন্ন উৎসবে যোগদানের জন্য আমি একটি বাড়ীতে রাতে অবস্থান করতাম। সেই পরিবারের সদস্যদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এখনও সেই সময়ের স্মৃতি স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-তিন

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী

আলোচ্য অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর একটি অবস্থা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে গবেষিত এলাকার গারো নৃগোষ্ঠীরও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর অবস্থা

যদিও বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশ, কিন্তু এর রয়েছে হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। ইতিহাসের বিভিন্ন পরিক্রমায় বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থান থেকে আর্য, দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলিয়ানরা এদেশে এসেছে এবং বসতি স্থাপন করেছে। নৃতাত্ত্বিক এবং বর্ণগত ভাবে বাংলাদেশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহু বর্ণ গোষ্ঠীর এক মিলনমেলা। বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী সমূহ জাতি তাত্ত্বিকভাবে সমতলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই নৃগোষ্ঠীগুলোর তিব্বত থেকে থাইল্যান্ড এই বিশাল অঞ্চলের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিশেষ শারীরিক সাদৃশ্যতা রয়েছে (রাজপুত, ১৯৬৫, ৬)। [("The tribe of Bangladesh are ethnically different froms people of the plains and appear to have some link with the prientitive tribs of the vast belt extending from Tibet down to Thailand" (Razput, 1965:6)]

নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যদিও কিছু সংখ্যক সমতল অঞ্চলে বসবাস করে, তবে অধিকাংশই সংলগ্ন বনাঞ্চলের অধিবাসী। যেসব নৃগোষ্ঠী পাহাড় এবং বনাঞ্চলে বসবাস করে থাকে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার জন্য দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর থেকে তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন। যাহোক, পাহাড়ের ঢালু অংশ বা সমতল অঞ্চলে প্রায় সব নৃগোষ্ঠী সমূহ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে বৃহত্তর সংস্কৃতির সাথে আত্তীকরণ (assimilation) প্রক্রিয়ার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে।

যদিও শারীরিক গঠন বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর পৃথক, কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশের গায়ের রঙ মাঝে মাঝে কিছুটা খয়েরী, চুল সোজা ও কালো, উচ্চতা মাঝারী এবং শারিরীক গঠন কাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী। নাক চ্যাপ্টা প্রকৃতির, চোখ কিছুটা ছোট, চোয়ালের হাড় দৃশ্যমান কিন্তু তিব্বতীয়দের মত চোখ এত বেশী ছোট নয়। তাদের নাকও তিব্বতীয়দের চেয়ে আর একটু উন্নত।

বাংলাদেশে বেশ কিছু সংখ্যক আদিবাসীগোষ্ঠী বসবাস করে থাকে। চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে মূলত চাকমা, মারসা, ত্রিপুরা, থানচাঙগুয়া, ম্রো, উখী, লুসাই, রোম পাঙকুয়া, চাক, খিয়াং এবং খোমোল (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০০২: ৩৩)। এ অঞ্চলের অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসীগোষ্ঠী হচ্ছে মুরং, মগ, কুকী, বেনজোগী এবং রেয়াং (রাজপুত, ১৯৬৫: ৬)। সিলেট জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের সম্মুখ দিকে খাসীয়া এবং জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে খাসীয়া, পাঙচাঙগা ও মনিপুরি নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। গারো, হাজং, ডালুসী, বানাস, এবং চোক নৃগোষ্ঠী একত্রিতভাবে বসবাস করে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং টাঙ্গাইল জেলায় এরা মূলত: বসবাস করে গারো পাহাড়ের পাদদেশে এবং বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত উচ্চ ভূমিতে (সাত্তার, ১৯৭৫: ১; বাঃপঃজ, ১৯৯১ ৩৩)। সাঁওতাল, ওরাং, হোস, মান্দি এবং রাজবংশীরা বসবাস করে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এবং রাজশাহী জেলায়।

বাংলাদেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হচ্ছে ১২,০৫,৯৭৮ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১.০৩ ভাগ। মোট আদিবাসীর জনসংখ্যার মধ্যে ৬,১৬,৮৭৮ জন পুরুষ এবং ৫,৮৯,১০০ জন মহিলা। লিঙ্গ ভিত্তিক অনুপাত হচ্ছে ১০৪ জন পুরুষ ঃ ১০০ জন মহিলা (বাঃপঃজ, ২০০১)। নীচের তালিকাতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আদিবাসীগোষ্ঠীসমূহের সংখ্যা এবং অবস্থানের উল্লেখ করা হল।

তালিকা-১: বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসী জনসংখ্যা এবং তাদের অবস্থানের অঞ্চলসমূহ।

ক্রমিক নং	আদিবাসীর পরিচিতি	অবস্থানের অঞ্চলসমূহ	সংখ্যা		উল্লেখযোগ্য মন্তব্য
			উৎস: বাপজ	উৎস: কারিতাস বাংলাদেশ	
১.	চাকমা	পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার	২,৫২,৮৫৮	৩,০০,০০০	ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী
২.	সাঁওতাল	রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নাটোর এবং সিলেটের চা বাগান	২,০২,৭৪৪	১,৬৫,০০০	দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে সাঁওতালরা সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী
৩.	মারমা	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান	১,৫৭,৩০১	১,৭০,০০০	পার্বত্য অঞ্চলে মূলত বসবাস করে থাকে
৪.	ত্রিপুরা রাইয়াংসহ	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, চাঁদপুর	৮১,০১৪	৮৫,০০০	এরা পার্বত্য অঞ্চল এবং অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে।
৫.	গারো (মান্দি)	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রংপুর, গাজীপুর, সিলেট, ঢাকা	১,২০,০০০	১,০০,০০০	খৃষ্টধর্মের সংস্পর্শে এরা বর্তমানে যথেষ্ট প্রগতিশীল
৬.	মনিপুরি	বৃহত্তর সিলেট এবং ঢাকা	২৪,৮৮২	৪৫,০০০	সবচেয়ে অগ্রসরমান
৭.	মুরং (ম্রো)	রাঙামাটি, বান্দরবান	২২,১৭২	৩০,০০০	এদের অন্যান্য অঞ্চলে খুব কমই দেখা যায়।
৮.	তাংচাঙগা	রাঙ্গামাটি, বান্দরবন	মন্তব্য		
৯.	রাখাইন (মগ/মারমা)	পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার, বান্দরবান	১৬,৯৩২	৩৫,০০০	তারা দাবী করে থাকে সংখ্যাগতভাবে তারা ১,৫০,০০০ জন

Dhaka University Institutional Repository

১০.	কোচ	বৃহত্তর ময়মনসিংহ গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া	১৬,৫৬৭	১৬,০০০	মন্তব্য
১১.	ব্যোম	বান্দরবান	১৩,৪৭১	৪,০০০	সরকারী ভাষ্য অনুসারে ৬,৯৭৪ (বাপজ, ১৯৯১)
১২.	খাসিয়া	বৃহত্তর সিলেট	১২,২৮০	২৬,৫০০	জৈন্তারজা বাঙালমুখী
১৩.	ওরাও	রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট চা বাগান	৮,২১৬	৭৫,০০০	
১৪.	রাজবংশী	উত্তর বাংলা	৭,৫৫৬		
১৫.	বানাই	বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী	২,০০০	৭,৪২১	
১৬.	মাহাত্ম	দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, জয়পুরহাট, রাজশাহী	৩,৫৩৪	৬৫,০০০	কারিতাস এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরীপের ব্যবধান বেশী।
১৭.	পাংখো	রাঙামাটি, বান্দরবান	২,৩৪৩	৫,০০০	
১৮.	খিয়াং	রাঙামাটি, বান্দরবন	২,৩৪৩	৫,০০০	
১৯.	মান্ডা	বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া	২,১৩২	২৫,০০০	
২০.	চাক	বান্দরবান	২,১২৭	২,১৯৬	
২১.	পাহাড়ী	বৃহত্তর রাজবাড়ী, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া	১,৮৫৭	১০,৯১৬	
২২.	খুমী	বান্দরবান	১,২৪১	২,০০০	
২৩.	হরিজন	বৃহত্তর রাজশাহী	১,১৩২		
২৪.	লুসাই (কুকী)	বান্দরবান, রাঙামাটি	৬৬২	১,০০০	
২৫.	ম্রো (মারো)	বান্দরবান, রাঙামাটি	১২৬		
২৬.	ভুমুই	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৫,২৩২	৭,২৯২	
২৭.	বানাই	বৃহত্তর ময়মনসিংহ		২,০০০	
২৮.	ডালু	বৃহত্তর ময়মনসিংহ		২,০০০	
২৯.	মাহার	দিনাজপুর, বগুড়া		১৫,০০০	
৩০.	সসং	বৃহত্তর পাবনা		৩০,০০০	
৩১.	বসাক	বৃহত্তর পাবনা		১৫,০০০	
৩২.	খারিয়া	বৃহত্তর সিলেট, জয়পুরহাট		৫,০০০	
৩৩.	খান্ডা	বৃহত্তর সিলেট		৫,০০০	

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (B.B.S), ১৯৯৮; করিতাস বাংলাদেশ রিপোর্ট, ১৯৯৮।

দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এক তৃতীয়াংশেরও বেশী আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করে। এরপর দেশের ঘনবসতিপূর্ণ আদিবাসী অঞ্চল হচ্ছে, সিলেট ১১৯%, রাজশাহী ১১%, দিনাজপুর ৬% এবং ময়মনসিংহ ৬.৮%। রংপুর, বগুড়া, খুলনা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা এবং চট্টগ্রাম জেলাতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে যার সংখ্যা ১০ থেকে ৫০ হাজার।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে আদিবাসীদের প্রকরণ হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ২৪.১%, বৌদ্ধ ৪৩,.৭%, খৃষ্টান ১৩.২% এবং অন্যান্য ১৯.০%। আদিবাসী জনগণের স্বাক্ষরতার হার ১২.৪% যেখানে সারাদেশে স্বাক্ষরতার হার ১৯.৭%। আদিবাসী জনগণের স্বাক্ষরতার হার পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ১৮.০% এবং ৬.৫%। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্বাক্ষরতার হার ১২.২%, বৌদ্ধদের মধ্যে ১২.২%, খৃষ্টানদের মধ্যে ২২.৬% এবং অন্যান্য ৫.৮% (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ, ১৯৯১)। সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যায় বিবাহিত ৬০.২% অর্থাৎ ৩,৬৭,৬৬৯ জন, অবিবাহিত ৩২.২% অর্থাৎ ১,৯৮,২৮৭ জন। বিধবা এবং বিপত্নীক ৬.৬% অর্থাৎ ৪০৭০৬ জন এবং তালাকপ্রাপ্ত ০.৬% অর্থাৎ ৩,৪৫৬ জন। আদিবাসী গৃহস্থালীর গড় আয়তন হচ্ছে ৫.৫ জন, যেখানে সমগ্র দেশের গৃহস্থালীর গড় আয়তন ৫.৭ জন।

দেশের মোট আদিবাসী শ্রমশক্তির সংখ্যা ৩,০০,৩২৩ জন যার মধ্যে ২,৩৭,৯৫২ জন পুরুষ (৭৯.২%) এবং ৬২,৩৭১ জন মহিলা (২০.৮%) (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ, ২০০১)। আদিবাসী শ্রমশক্তি দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র শতকরা ১.৩% ভাগ। মোট আদিবাসীয় শ্রমশক্তির মধ্যে ১,৮৮,৮৭৪ জন অর্থাৎ ৬২.৯% নিয়োজিত রয়েছে কৃষিকাজে, ৮,৮৩৬ জন বা ২.৯% ভাগ নিয়োজিত অ-ফসলী কৃষিকাজে, ২৩,০০২ জন বা ২৩.৪% অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। অধিকাংশ আদিবাসী পুরুষ কৃষি এবং ব্যবসা পেশায় নিয়োজিত। আদিবাসীয় বেশীরভাগ মহিলা অ-ফসলী কৃষি, উৎপাদন এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত।

গারোরা মাতৃবংশীয় এবং মাতৃস্থানীয় জনগোষ্ঠী। মূলত গারো পাহাড় এবং বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যের তৎসংলগ্ন সমভূমিতে এরা বসবাস করে। গারোরা বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র, উপগোত্র এবং বংশধরায় বিভক্ত। যেসব গারো গোষ্ঠী পাহাড়ে বসবাস করে তারা পাহাড়ী বা পাহাড়ী গারো নামে পরিচিত এবং যেসব গারো গোষ্ঠী সমভূমিতে বসবাস করে তারা 'লামদানী' অথবা সমতলীয় গারো নামে পরিচিত (বোস, ১৯৮০: ১০৩)। উৎরাইল গ্রামের সবাই সমতলীয় গারো।

সুদূর অতীত থেকেই গারো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাস করছে গেজেটিয়ার, ১৯১৭, ৪০)। ১৮৮১ সালের জরীপে দেখা যায় সে সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার গারো অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫,৯৫৫ (মজুমদার, ১৯০৬: ৪৩)। ১৮৯১ সালের জরীপে দেখা যায় তাদের সংখ্যা বেড়েছে ২৮,০৮৫ জন। এর পরবর্তী বছরগুলোতে ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকৃত গারো নৃগোষ্ঠীদের সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ১৯০১ সালে ৩৩,১৯১ জন, ১৯১১ সালে ২৮,৪৮১ জন এবং ১৯২১ সালে ৩৯,৫৮১ জন ১৯৩১ সালে এই অঞ্চলে বসবাসকৃত নৃগোষ্ঠীদের সংখ্যা ৩৪,২৮৬ বলে অনুমান করা হয়(জরীপ, ১৯২১: ৩৬২)। এরপর ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালে আর একবার জনসংখ্যা জরীপ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়, কিন্তু উভয় জরীপেই নৃগোষ্ঠী সম্পর্কিত কোন বিশদ তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ এবং ১৯৮১ আদিবাসীয় জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি আনুমানিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। অনুমান করা হয় সমগ্র বাংলাদেশের মোট গারো জনগোষ্ঠী প্রায় ৯০,০০০ (খালেক, ১৯৮৩, ১৫৪)। বর্তমানে গারো নৃগোষ্ঠী ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, রংপুর, সিলেট বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্তবর্তী অতুচ্চ পাহাড়সমূহে বসবাস করে থাকে।

গারোদের একটা প্রধান অংশ টাঙ্গাইল জেলার "মধুপুর গড়" নামে পরিচিত বনাঞ্চলে বসবাস করে। মধুপুর গড় বাংলাদেশ সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং এর একটা অংশ জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। এছাড়া গারো জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে ঢাকা জেলার উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল, রংপুর এবং সিলেট চা বাগানের সীমানা বরাবর বসবাস করে থাকে।

৩.২ গারো নৃগোষ্ঠীর প্রতিকৃতি

গারোরা মাতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃস্থানীয় সমাজের প্রতিকৃতি। এরা মূলতঃ গারো পাহাড়ের অধিবাসী। গারোরা গারো পাহাড় সংলগ্ন ভারতের মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী উচ্চভূমিতেই মূলতঃ এদের বসবাস। বসবাসের প্রকৃতি অনুযায়ী গারোদের সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। পাহাড়ী গারো বা আচিক মান্দে; এবং

২। সমতলীয় গারো বা লামদানী মান্দে।

সামাজিকভাবে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী, গোত্র, উপগোত্র এবং বংশধারায় বিভক্ত। উৎরাইল গ্রামে মূলতঃ সমতলীয় গারো বসবাস করে। গারো জনগোষ্ঠী অনেক দিন আগে (গেজেটিয়ার ১৯০৭: ৪০) থেকেই বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাস করছে। ১৯৮১ সালের শুমারীতে দেখা যায় ময়মনসিংহে গারো অধিবসীর সংখ্যা ছিল ২৫,৯৫৫ (মজুমদার, ১৯০৬: ৪৬)। ১৮৯১ সালে তাদের জনসংখ্যা ২৮,০৭৪ এ উন্নীত হয়। তাদের জনসংখ্যা ১৯০১ সনের শুমারীতে ৩৩,১৮১, ১৯১১ সালের শুমারীতে ৩৮,৪৮১ এবং ১৯২১ সালের শুমারীতে ৩৯,৫৮১ জন এ দাঁড়ায়। ১৯৩১ সালের গণনায় দেখা যায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার গারো আদিবাসীর সংখ্যা ৩৪,২৮৬।

ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম শুমারী হয় ১৯৫১ সালে এবং দ্বিতীয় শুমারী হয় ১৯৬১ সালে। কিন্তু এই দু'টি শুমারীতে উপজাতীয় জনসংখ্যা সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যায় না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ এবং ১৯৮১ সনে সব উপজাতীয় অবস্থান প্রকাশিত হয়। বর্তমানে গারো অধিবাসীর সংখ্যা ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী ১,০২,০০০ জন। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল জেলায়

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অংশে গারোরা বসবাস করে। এ ছাড়া গাজীপুর জেলার শ্রীপুর, রংপুর জেলার উত্তর পূর্ব কিনার, সুনামগঞ্জ ও সিলেটের চা বাগানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গারো বসবাস করে।

আমার আলোচ্য গ্রাম হচ্ছে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিসিড়ি ইউনিয়নের উৎরাইল গ্রাম। এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৬২১ জন। এর মধ্যে গারো ৫৫০ জন (৯০.১৭%)। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এরা এই গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী। অধিবাসীদের মধ্যে ৯৯.৪৬% ভাগ খৃষ্টান, এবং ০.৫৪% জন সাংসারেক ধর্মের অনুসারী। এই গ্রামের ১১৪টি পরিবারের মধ্যে ২৭টি পরিবারের বসতবাড়ী ছাড়াও নিজস্ব জমি আছে। ৮৭ টি পরিবারের শুধু বসতবাড়ী আছে। এই গ্রামের বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠীর আয়সীমা সীমিত। এর পরও এই গ্রামের ৯৯.৪৬% লোক স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। এই গ্রামে বেশ কয়েকটি এন,জি,ও খুবই সফলভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ-সংস্থান, প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা রয়েছে।

জাতিতাত্ত্বিকভাবে গারো নৃগোষ্ঠী অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত বলে মঙ্গোলয়েড শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের মধ্যে বিদ্যমান যেমন উচ্চতায় একটু খাটো এখন অবশ্য প্রায় সবাই বাঙ্গালীদের সমান উচ্চতা অর্থাৎ মাঝারী, গোলাকার এবং চ্যাপ্টা মুখমন্ডল, চ্যাপ্টা এবং প্রশস্ত নাক, কপাল ছোট, চোখও ছোট এবং টানা, কানগুলি একটু বড়, ঠোটগুলো পুরু, এবং চোয়ালের হাড় চোখে পড়ার মত ইত্যাদি। তাদের চুল সাধারণত কালো, ঢেউ খেলানো এবং কোকড়া। চোখের রঙ কালো। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই পাতলা গড়নের অধিকারী, কিন্তু তারা প্রচন্ড পরিশ্রমী এবং শক্তিশালী (খালেক, ১৯৮৩: ১৫৫)।

৩.৩ ভৌগলিক এবং সামাজিক অবস্থান

যে কোন গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক জীবন প্রকৃতির সাথে সাথে বিচিত্র সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হলেও এখানে আরও অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাস করে। এর মধ্যে কিছু নৃগোষ্ঠী আছে যারা ভারত এবং মিয়ানমারে অবস্থিত নৃগোষ্ঠীগুলোর অংশ। যদিও এই নৃগোষ্ঠীসমূহ আজও তাদের স্বকীয় অস্তিত্বে বিদ্যমান তারপরও বলা যায় সময়ের চলমান প্রক্রিয়া, ধর্মান্তরকণ প্রক্রিয়া, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শ এই নৃগোষ্ঠী সমূহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের সমাজ একটি পরিবর্তনশীল অধ্যায় অতিক্রম করছে এবং এর অনিবার্য কারণ হিসাবে এখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে।

নৃগোষ্ঠীগুলো এমন একটি অধ্যায়কে প্রতিনিয়ত অতিক্রিম করছে যেখানে তাদের ঐতিহ্যবাহী সমাজ কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ব্যবহার্যতা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং পরিবর্তনের নিত্য নতুন চাপ বিভিন্ন দিক থেকে তাদের সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক অবস্থা তথা জীবনধারন পদ্ধতিতে

Dhaka University Institutional Repository

গভীর প্রভাব ফেলছে। গারো নৃগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল পথ পরিক্রমায় তাদেরও অংশীদারত্ব আছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক উল্লেখ্য ব্যতিরেকে গারো সমাজকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা অর্ধেক বাস্তবতার নামান্তর। অতএব, গবেষণাকৃত গ্রামটির বৃহত্তর অংশ হিসাবে বর্তমান অধ্যায়টি নিবেদিত হয়েছে ভৌগলিক এবং সামাজিক অবস্থানকে বর্ণনা করে।

৩.৪। বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ উপত্যকায় অবস্থিত। বিশ্বের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এইদেশ। এটা দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরপূর্ব দিকে ২০°৩৪/ এবং ২৬°৩৪/ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১/ এবং ৯২°৪১/ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ, ২০০১: xxii)। এটা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বদ্বীপের একটা অংশ এর দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর। এই দেশ উত্তরে পশ্চিমে ভারত এবং পূর্বে ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৮,৩৯৩ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১২৩.৪০ মিলিয়ন। বাংলাদেশ পৃথিবীর নবম জনসংখ্যাগরিষ্ট দেশ এবং জনসংখ্যা ঘনত্বের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর। এর জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৪০ জন (মাহবুব, ১৯৯৭ঃ৫)। বাংলাদেশের মোট জলসীমা হচ্ছে ১২ নটিক্যাল মাইল এবং সমুদ্র সীমাসহ এর আয়তন ২০০ নটিক্যাল মাইল (বা.প.জ, ২০০১)। দেশের মোট নদীর আয়তন ২২,১৫৫ বর্গমাইল এবং বনাঞ্চল ১৬,৪৪১.৯৯ বর্গ মাইল।

দেশের তিন দিক উত্তর, পূর্ব, পশ্চিমে ভারত, পূর্বদিকেও ভারত এবং সর্বপূর্বে মিয়ানমার। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর দিয়ে সীমানা নির্ধারিত। উত্তর পূর্ব দিকে আসাম পর্বতমালা এবং শিলং মালভূমি। দেশের উত্তর সীমান্তের নিকটবর্তী হিমালয় পর্বতমালা। হিমালয়ের একটি শাখা তেরিয়ারী নামে দক্ষিণ সিলেট থেকে চট্টগ্রামের পূর্বপ্রান্তে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অতিক্রম করে মিয়ানমারে আরকান নামে পরিচিত হয়েছে (আখতার, ১৯৮১:১৯-২০)। বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত। দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট বড় অসংখ্য নদী এবং খাল। এছাড়াও অসংখ্য বিল সর্বোত্র ছড়িয়ে রয়েছে। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথমত: গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত নিম্ন সমভূমি এবং দ্বিতীয়ত: চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চল (রবিনসন, ১৯৭৮:১৯০-১৯৭)।

গঙ্গা বিধৌত সমভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম নিম্নসমভূমি, যা ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ এর সাথে যুক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরের মাথায় পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশে যে ভূমি জরীপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ভূ-প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র অঞ্চলে ৫০০ ধরনের মৃত্তিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জরীপ অনুসারে এই ৫০০ ধরনের মৃত্তিকাকে বৃহত্তর ২০টি বিভাগের

Dhaka University Institutional Repository

আওতায় আনা হয়েছে। আরও বৃহত্তরভাবে সমগ্র ভূ-প্রকৃতির ধরনসমূহকে মূলত ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলা হলো পার্বত্য অঞ্চল, উচ্চভূমি এবং প্লাবন সমভূমি।

চট্টগ্রামের পর্বতসমূহ নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। দেশের মোট ভূমির শতকরা ১২ ভাগ এ অঞ্চলের অন্তর্গত। পার্বত্য অঞ্চলকে আবার দুটি ভাগে ভাগে করা যায়, যথা- উচ্চ পর্বতমালা এবং অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াচড়ি জেলা এ নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলের উচ্চতা ১,০০০ থেকে ৩,০০০ ফুট। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৩,৪৫৪ ফুট। অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫০০ ফুটের কম। অনুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ঘনবন আছে।

উচ্চভূমি অঞ্চলে দু' ধরনের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়; প্রথমত মধুপুর অঞ্চল এবং দ্বিতীয়তঃ বরেন্দ্র অঞ্চল। এই উচ্চভূমি অঞ্চল দেশে মোট ভূমিভাগের শতকরা ৮ ভাগ অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল জেলা, যমুনা নদীর পূর্ব উপকুল, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী অঞ্চল (আখতার, ১৯৮১:২১) সাধারণভাবে মধুপুর জঙ্গল নামে পরিচিতি (নকী. ১৯৮২:৪৫)। যমুনা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে বরেন্দ্র অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এর আয়তন প্রায় ৩,৬০০ বর্গমাইল। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০ থেকে ৪০ ফুট। প্লাবন সমভূমি অঞ্চল দেশের প্রায় ৮০% এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। পাললিক সমতলভূমি, সর্পিল এবং বিনুনি গাথুনীর অনেক স্রোতস্বীনী নদী এই সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এই সমতল ভূমির উপর দিয়ে যে সব নদী প্রবাহিত হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, তিস্তা এবং কর্ণফুলী যা সর্বদা প্রবাহমান ধারায় প্রবাহিত। মোট ছোট বড় ২৩০টি নদী দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যার দৈর্ঘ্য মোট ১,৫০০ মাইল (আখতার ১৯৮১: বা,প,জ, ১৯৮২:৩)।

বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে নদীর রয়েছে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। নদী যোগাযোগ এবং যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদের উৎস এবং দেশের বৃহত্তম পয়:নিস্কাশন পথ। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ নদীবাহিত উর্বর পলি দেশের ভূমিভাগকে আরও উর্বর করে তোলে। হাটম্যান এবং বয়েস বলেন "বাংলাদেশ উর্বর ভূমি, পানি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। শুধু তাই নয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু দ্রুত বাড়ন্ত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য রপ্তানীতে সক্ষম নয়" (হাটম্যান ও বয়েস, ১৯৭৯: ৮)

যদিও নদীর প্লাবন ভূমি আরও উর্বর হয় কিন্তু প্রতিবছর বন্যা এবং জলোচ্ছাসে বহু লোক এবং সম্পদের ক্ষতি হয় যা প্রায়ই অপূরণীয় ক্ষতিতে পরিণত হয়। নদী বিধৌত প্লাবন সমভূমিকে

Dhaka University Institutional Repository

আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত: পূর্বদিকের পার্বত্য পাদদেশীয় সমতল ভূমি। দ্বিতীয়ত: গাঙ্গের স্রোতধারার প্লাবন সমভূমি যার ওপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং মধুমতি নদীর দক্ষিণ এবং পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত জলমগ্ন গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন। তৃতীয়ত: গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত বৃহৎ প্লাবন সমভূমি। এই অংশটির দেশের অধিকাংশ ভূমিভাগ অধিকার করে আছে। চতুর্থত: পূর্ব এবং নতুন মেঘনা অববাহিকা যা প্রায় সমতল কিন্তু কোথাও কোথাও উঁচু-নীচু (আখতার, ১৯৮১:২২)।

এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলাদেশ প্রধানত নদীমাতৃক দেশ। প্রথমত: গঙ্গা এবং পদ্মা এর সংলগ্ন বদ্বীপ স্রোতধারা, দ্বিতীয়ত: মেঘনা এবং সুরমা স্রোতধারা, তৃতীয়ত: ব্রহ্মপুত্র সংযুক্ত প্রণালীসমূহ, চতুর্থত: উত্তর বঙ্গের নদীসমূহ এবং পঞ্চমত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সংলগ্ন সমভূমির নদীসমূহ যার বৈশিষ্ট্য (নকী, ১৯৮২:৪৩)। প্রতিটি নদী সম্মিলিতভাবে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে এবং সৃষ্টি করেছে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন এদেশের নদীর গতিপথ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানন্দা এবং অন্যান্য নদীগুলোর গতিপথের পরিবর্তন বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে মানচিত্র প্রদান করেন ভ্যানডেম ব্রুক। নদী একদিকে প্রবল ভাঙ্গনে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে এবং একই ভাবে অন্যদিকে এর গর্ভ হতে নতুন ভূ-ভাগের জন্ম দেয় যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় চরা বা চর অঞ্চল। এক একটি এরকম প্রাকৃতিকভাবেই উৎপত্তি হয়। পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে অবস্থিত ময়মনসিংহের উত্তরাংশ এবং সিলেট। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এসব অঞ্চলে "হাওড়" এর সৃষ্টি হয়। নদ-নদীর মতো এদের প্রকৃতিগত স্থায়িত্ব দীর্ঘ না থাকলেও হাওড়গুলো স্থায়িত্ব প্রকৃতির অংশ। বাংলাদেশের আবহাওয়া গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর্দ্র। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী বর্ষকাল। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭০ থেকে ৪০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত, সে কারণেই বাংলাদেশের তাপমাত্র ৭.৫ ডিগ্রি সেঃ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত ওঠানামা করে। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৬.২৫ ডিগ্রি সেঃ। বছরের সবসময় আর্দ্রতা বেশী থাকে। গ্রীষ্মকালে এটা ৮৪% থেকে ৯০% এবং শীতকালে ৬৫% থেকে ৯২% পর্যন্ত ওঠানামা করে। অনুকূল বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতা বাংলাদেশের আবহাওয়াকে সমগ্র বছর জুড়ে কৃষিকাজ এবং মৎস পালনের অনুকূলে রেখেছে। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষিসংস্থা বাংলাদেশকে পৃথিবীর সর্বাধিক ধনী দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে শুধুমাত্র এর আভ্যন্তরীন মৎস্য সম্পদের কারণে।

এদেশ বৃক্ষ সম্পদে সমৃদ্ধ। মোট ভূমি অঞ্চলের ১০% বনাঞ্চল। প্রধানত তিন ধরনের বনাঞ্চল লক্ষ্য করা যায়। যথা– পার্বত্য বনাঞ্চল, উপকূলীয় বনাঞ্চল এবং শাল বন (আখতার, ১৯৮১:৮০)। পার্বত্য বনাঞ্চলে রয়েছে গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরসবুজ এবং হরিৎ বৃক্ষরাজি। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

গর্জন, জারুল এবং অসংখ্য বাঁশ গাছ। এই বনাঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। উপকূলীয় বনাঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ অবস্থিত যেমন- সুন্দরী, কেওড়া এবং গেওয়া এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটি সুন্দরবন নামে খ্যাত। এটা বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম জেলার সমগ্র উপকূল জুড়ে বেষ্টিত হয়েছে। শাল বনে অন্যান্য চিরসবুজ বৃক্ষের সাথে প্রধান বৃক্ষ শাল অবস্থিত। এই চিরসবুজ বনভূমিটি ঢাকা, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল জেলা এবং রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

এদেশে অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ফলজ বৃক্ষ যেমন– তাল, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি দেখা যায়। বনজ বৃক্ষের মধ্যে শাল, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আরও আছে শিমুল, কলা ইত্যাদি বিচিত্র বৃক্ষের সমাহার। বাংলাদেশের গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চলে বন্য পশু আছে। এর মধ্যে বাঘ, হাতি, ভালুক, হরিন, বোয়ার, চিতাবাঘ, কুমীর এবং প্রধান। গরু একটি গুরুত্বপূর্ণ পশুসম্পদ হিসাবে দেশের সর্বোত্র বিবেচিত।

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এর মোট জনসংখ্যা ১২,৩১,৫১,২৪৬ কোটি (বা.প.জ, ২০০১) যা ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বে সর্বাধিক। এদেশে প্রতি কিলোমিটারে ৮৩৪ জন বসবাস করে। প্রজনন হার উচ্চ, ৩৩ জন প্রতি হাজারে এবং মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম, ১১.৫ জন প্রতি হাজারে। বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার বেশী, ৪৪ জন প্রতি হাজারে। (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০০৫) এদেশে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের গড় আয়ু ৫৬ বৎসর যা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সর্বনিম্ন (বা.প.জ, ১৯৯১)। মোট জনসংখ্যার ৪৮% মহিলা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার বার্ষিক ১৭% যার একটা বৃহত্তর অংশ যুবক এবং যা এটা আর্থ-সামাজিক জীবনে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করছে (মাহবুব, ১৯৯৭:১৭)। নিচের সারণী-১ এ বাংলাদেশের জনসংখ্যার তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণী-১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা তথ্য

অনুসূচক	জরিপ বর্ষ ২০০১	জরিপ বর্ষ ১৯৯১
মোটি জনসংখ্যা (কোটি)	১২.৩১	১০.৬৩
পুরুষ	৬.২৭	৫.৪৭
মহিলা	৬.২৭	৫.১৬
পুরুষ:মহিলা (অনুপাত)	১০৩.৮	১০৬.১
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৪৮	২.১৭
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	৮৩৪	৭২০

(উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ, আগষ্ট ২০০১)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রধান ধর্ম ইসলাম এবং ৮৬.৬% লোক এই ধর্মের অনুসারী। হিন্দু ধর্মের অনুসারী ১২.১%, এটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম, এবং বুদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী হলো যথাক্রমে ০.৬%, ০.৩% এবং ০.৩%।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং প্রত্যেকেই বাংলায় কথা বলতে পারে। শহরে কিছু অভিজাত শ্রেণী ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। গারো নৃগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই বাংলায় কথা বলতে পারে। এদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী জানে।

এদেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামের অধিবাসী যা শতকরা ৮৪.৯% এবং শহরে বাস করে ১৫.১% (বা.প.জ, ২০০১:xxii)। যাহোক, এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা প্রতিনিয়তই এই সীমিত সংখ্যক জমি এবং সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের বর্তমান স্বাক্ষরতার হার ৪১%। এর মধ্যে পুরুষ ২৫.৮% এবং মহিলা ১৩.২% (বা.প.জ, ২০০১)। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম শ্রমশক্তি বলতে তাদেরকেই বোঝান হয় যারা উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি, যাদের বয়স ১০ এর ওপরে এরা মোট জনসংখ্যার ২৩.৬% অংশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। এর মধ্যে পুরুষ শ্রমশক্তির পরিমাণ ২২.৪% এবং মহিলা ১.২%। মোট শ্রমশক্তির অধিকাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত যা মোট শ্রমশক্তির ৫ ভাগের ৩ ভাগ (৫৯.৩%)। দেশের মোট বার্ষিক আয় মাথাপিছু ২২৩৯ টাকা (১৯৮১-৮২)। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি যার বার্ষিক আয় ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে জনপ্রতি ১৮,২৬৯ টাকা মাত্র (বাংলাদেশের পরিসংখ্যান জরিপ, ২০০১)।

বর্তমানে এদেশ দ্রুত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নগরায়নের হার ১৫.২%। ১৯৬১ সাল থেকে নগরগুলোতে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বাড়ছে। ২০০১ সালের পরিসংখ্যান জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২৩.৩৯% নগরে এবং ৭৬.৬১% গ্রামে বসবাস করে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্যাস, চুনামাটি, কয়লা, সিলিকা, কঠিনশিলা, বালি ইত্যাদি। কিন্তু শিল্পায়নের গতি যথেষ্ট মন্থর। বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হচ্ছে পাটজাত দ্রব্য, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, রেয়ন, চিনি, সিমেন্ট, বস্ত্র, সার, চামড়া এবং তৈরী পোষাক। অন্যান্য শিল্প হচ্ছে তাঁত বস্ত্র, সিরামিক সামগ্রী, ঔষদ, প্রকৌশল এবং তড়িৎ কৌশল যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, লৌহ, তৈল শোধন, জাহাজ তৈরী এবং জাহাজ ভাঙ্গা। এদেশ মোটামুটিভাবে ক্ষুদ্র শিল্পে সমৃদ্ধ। এদেশে সরকারের একটি সুসংহত রূপ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিকভাবে দেশটি ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। ক্রমোচ্চ এই সংগঠনে বিভাগ সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ করে, এরপর জেলা, তৃতীয় ধাপে উপজেলা বা থানা এবং চতুর্থত ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে দেশের লোক প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর। এই সংগঠনের কাজ হচ্ছে গ্রামবাসীদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এর আওতাধীন বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সমন্বয় করা। যেমন- খাদ্য উৎপাদন, সেচব্যবস্থা, বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম, পরিবার-পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, খাজনা আদায়, সড়ক উন্নয়ন এবং পয়নিষ্কাশন ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরিচালনা এবং সমন্বয় করা। বাংলাদেশের মোট গ্রামে সংখ্যা ৮৭,৩১৭ টি, মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৪৮৪টি এবং মোট থানার সংখ্যা ৫০৭টি। এদেশের মোট জেলার সংখ্যা ৬৪টি, মোট বিভাগের সংখ্যা ৬টি। এছাড়াও ৪টি প্রধান নগর পৌরসভা আছে এবং আরও ২২৩টি ক্ষুদ্র পৌরসভা আছে। এটা বাংলাদেশের সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো।

৩.৪.১। নেত্রকোনা জেলা

নেত্রকোণা ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একটি উপ-বিভাগ। ১৯৮৪ সলের ১লা ফেব্রুয়ারী একে জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই জেলার সীমানা উত্তরে ভারত, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা, দক্ষিনে কিশোরগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা দ্বারা নির্ধারিত। এই জেলার মোট আয়তন ২,৮১০.৪০ বর্গ কিঃ মিঃ (১,০৮৫.১০ মাইল)। এর মধ্যে ৩২.৫৮ বর্গ কিঃ মিঃ নদীর অঞ্চল এবং ৯.১৭ বর্গ কিঃ মিঃ বনাঞ্চল। এই জেলা ২৪°.৩৫′ এবং ২৫°.১২′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°.০০′ ও ৬১°.০৭′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে অবস্থিত (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ ১৯৯১: ৮)।

এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১৭,৩০,৯৩৫। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬১৬ জন। পুরুষ ও নারী অনুপাত ১০৪:১০০। স্বাক্ষরতার হার ২৩.৮৫%। এই জেলার মোট গৃহস্থালীর সংখ্যা ৩,০১,২৯৩। গৃহস্থালীর আকার প্রতিটিতে গড়ে ৫.৩০ জন বসবাস করে। পানীয় জলের উৎস হচ্ছে নলকূপ, পুকুর, নদী, খাল প্রভৃতি (বা.প.জ, ১৯৯১)। একসময় নেত্রকোনা ময়মনসিংহ জেলার একটি উপবিভাগীয় শহর ছিল ফলে নেত্রকোনা সম্পর্কে কোন পৃথক ইতিহাস এখনও জানা সম্ভব হয় নাই। নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং আবহাওয়া ময়মনসিংহ জেলার অনুরূপ। ময়মনসিংহ জেলা সম্পর্কিত কিছু তথ্য জানলে এ থেকে নেত্রকোনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হবে। এক সময় ময়মনসিংহ ছিল বাংলাদেশের সর্বাধিক জনবহুল জেলা। এর আয়তন ৬,৩৬১ বর্গমাইল। এই জেলা ২৩°.৫৪′ থেকে ২৬°.৩৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°.৪৯′ থেকে ৯১°.১৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী এটা জেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলার সীমানা হচ্ছে পশ্চিমে যমুনা নদী, দক্ষিণে ঢাকা জেলা এবং উত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশ। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বৃহত্তর এই জেলাকে ভেঙ্গে আরও জেলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এভাবে ১৯৭৪ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কোল থেকে টাঙ্গাইল জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জামালপুর জেলা। এর পরবর্তীতে আরও তিনটি জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় যেগুলো হলো শেরপুর, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা।

১৮৮২ সালের ৩রা জানুয়ারী নেত্রকোনাকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। নেত্রগোপাল রায় ছিলেন নেত্রকোনার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী নেত্রকোনা মিউনিসিপ্যালিটা স্থাপিত হয়। ১৯০৫-০৬ সালে এই মিউনিসিপ্যালিটার বার্ষিক আয় ছিল ৮৬৩১/- টাকা। ১৯০১ সালে নেত্রকোনার মোট জনসংখ্যা ছিল ১১,৪০২ জন (মজুমদার, ২০০৫, ২৩) ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই জেলার অনেক অবস্থান্তর ঘটে। অনেক খাল বিল ভরাট হয়ে যায়। নদীর গতিপথ পরবর্তিত হয়। ১৮৯৭ সালের ১২ইং জুন অপরাহ্ন ৫টা ১১ মিনিটে ১.৫ মিনিট স্থায়ী ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে সুসং দূর্গাপুরের তৎকালীন রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ পুত্রসহ নিহত হন(মজুমদার, ২০০৫, ৩৩)।

এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় এবং পরিচয় এর ধারা নিয়ে নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। অধিকাংশ পর্যবেক্ষণই অনুমানভিত্তিক, যার কোন সুনির্দিষ্ট ভিত্তি পাওয়া যায় নাই। তবুও নির্দিষ্ট কিছু নৃবিজ্ঞানীগণ খুবই সতর্কতার সাথে এ অঞ্চলের জনগণের উৎপত্তি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন (জেলা জরিপ, ১৯৬১:১৯)। অধিকাংশ জনগণই এ অঞ্চলে আর্যদের আগমনের আগে থেকেই এখানে বসবাস করত বলে মনে করা হয়। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্রাবিড় এবং টিবো বার্মন নৃগোষ্ঠীগত উপাদান এর যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। পরবর্তীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আর্যরা আগমনের পর আর্যদের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের মিশ্রনের ফলে এখানকার জনগোষ্ঠীর ত্বকের রঙ কিছুটা উজ্জ্বল হয়েছে, নাক ও কপাল উন্নত হয়েছে। চুল নরম এবং সোজা হয়েছে, মাথার আকৃতির কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে যা বেশীর ভাগ আর্য অধিবাসীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শারীরিক ধরণে নৃগোষ্ঠীগত মিশ্রণের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যদিও কোন জনগোষ্ঠীগতভাবে নিজেদের পূনৃ বিশুদ্ধতা দাবী করতে পারে না।

এই জেলার ভূমিভাগ গারো পাহাড় থেকে শুরু করে ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীর জুড়ে বিস্তৃত। জেলা ভূ-ভাগ নদীর তীর সমতলে অবস্থিত যা কৃষিকাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোট ছোট নদী এবং খাল আছে। যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী জেলার পশ্চিম দিকে সীমানা তৈরী করেছে। এই নদীটি পুনরায় একটি ছোট নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে যা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। জামালপুর ও নলিতাবাড়ী শহর ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত। কংস নদী, যার উৎপত্তি স্থল গারো পাহাড়, তা নলিতাবাড়ী শহর অতিক্রম করে সোগাই নাম ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। নেত্রকোণা শহরটি ভাংড়া নদীর তীরে অবস্থিত। এরকম ছোট ছোট উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী এ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

বর্ষামৌসুমে এই জেলার পশ্চিম এবং দক্ষিণপুর্ব অঞ্চলের একটা বিশাল অংশ পানির নীচে তলিয়ে যায়। তিন ধরনের মাটি এই জেলায় লক্ষ্য করা যায় যেমন–বেলে মাটি, কাঁদামাটি এবং দো-আশ মাটি। এই তিন ধরনের মাটির উর্বরতা পাট, ধান এবং সব্জী চাষে বিশেষ উপযোগী হিসাবে কাজ করে। শুধুমাত্র মধুপুর জঙ্গল এবং জেলার দক্ষিণ অংশের মাটির প্রকৃতি অন্যরকম।

দেশের অন্যান্য জেলার সাথে এ জেলার আবহাওয়ার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। প্রতিবছর গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮৭ ইঞ্চি। তাপমাত্রা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই।

এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ আছে। ফলের ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ হচ্ছে গজারী, বট, তেতুল, জামরুল কড়ই, শিমুল এবং অশথ প্রভৃতি। মধুপুর জঙ্গল এবং গারোপাহাড়ের পাদদেশে মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়। বন্যশূকর এবং শূকর প্রায়ই দেখা যায়। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরু, মহিষ এবং ছাগল প্রচলিত।

ময়মনসিংহ জেলায় ৪২টি থানা (উপজেলা), ৪৪৬টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৬৭৭১টি গ্রাম আছে। মোট জনসংখ্যা ৮৯৮৮১২। মোট গৃহস্থালীর সংখ্যা ১৬,৬০,২৩১ (পল্লী জনসংখ্যা জরিপ, ১৯৭৪:৩); (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান জরিপ, ১৯৮১:৭)। এ জেলার অধীন প্রতিটি উপশহরকে পরবর্তীতে এক একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলাটি ৭ ভাগে বিভক্ত হয়েছ যথা- টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ সদর (উত্তর) ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ), কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোণা। বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠী এই জেলার অধিবাসী যেমন মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান এবং অন্যান। অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগযোগের মাধ্যম হচ্ছে সড়কপথ, রেলপথ এবং নৌপথ। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলায় কথা বলে। এখানকার নৃগোষ্ঠীর অধিবাসীরাও বাংলায় কথা বলতে পারে।

৩.৩.৩ দূর্গাপুর থানা (উপজেলা)

সমগ্র নেত্রকোণা জেলায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে দূর্গাপুর হচ্ছে চতুর্থ বৃহত্তম থানা। ১১০৮ সালে সর্বপ্রথম এর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই থানার দূর্গাপুর নামকরণের কোন উৎস আজও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। যতদূর জানা যায় স্থানীয় ভাঙ্কর জায়গীর পরিবারে দূর্গাদেবী নামে এক বিদূষী মহিলা বাস করতেন। সর্ব সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করা হয় যে, দূর্গাদেবীর নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই থানার মোট আয়তন ২৯৩.৪২ বর্গ কিলোমিটার এর মধ্যে ৯.০১ বর্গ কিঃ মিঃ নদী এবং ৯.১৭ বর্গ কিঃ মিঃ বনাঞ্চল। এই থানা ২৪°.৫৭/ থেকে ২৫°.১২/ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°.২৮/ থেকে ৯০°.৪৮/ ডিগ্রি পূর্ব অক্ষাংশ এর মধ্যে অবস্থিত। এই থানার উত্তরে ভারত, পূর্বে কলমাকান্দা থানা, দক্ষিণে পূর্বধলা ও নেত্রকোণা সদর থানা এবং পশ্চিমে ধুবুরিয়া থানা দিয়ে সীমানা নির্ধারিত।

এই থানার মোট জনসংখ্যা ১,৬৯,১৩৫ জন এরমধ্যে ৮৫,৩৯৫ জন পুরুষ এবং ৮৩,৭৪০ জন মহিলা। মোট গৃহস্থালীর সংখ্যা ৩২,২৪৫টি এর মধ্যে ২,২৪৪টি নৃগোষ্ঠীয় গৃহস্থালী। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৭৬ জন। স্বাক্ষরতার হার ২৩.০%, লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত ১০২ জন পুরুষ বনাম ১০০ মহিলা। এই থানায় ৭টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১৩৪ মৌজা (খাজনা আদায় একক) এবং ২১৫টি গ্রাম আছে।

সমগ্র দূর্গাপুর থানায় বিরিসিরি ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গারো নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। বাংলাদেশের একমাত্র "উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী"টি এখানে অবস্থিত। এছাড়াও এই ইউনিয়নে একটি মিশনারী হাসপাতাল। একটি প্রটেষ্টান ও একটি ব্যাপটিষ্ট চার্চ, বেশকিছু মিশনারী স্কুল, একটি সিমেট্রে এবং অনেকগুলো বেসরকারী সাহায্য সংস্থা যেমন, কারিতাস, সিসিডিবি, ওয়াই.এম.সি.এ ওয়াই, ভব্লিউ, সি.এ.ব্র্যাক, প্রশিকা প্রভৃতি অবস্থিত।

বিরিসিরি ইউনিয়নের মোট আয়তন ৬,০০৫ একর। মোট জনসংখ্যা ১৫২৪১ জন, এরমধ্যে ৭,৬১২ জন পুরুষ এবং ৭,৬২৯ মহিলা। স্বাক্ষরতার হার ২৭.০২%। এই ইউনিয়নে ২৩টি গ্রাম আছে। এই ইউনিয়নের কিছু অংশ পৌরসভার অন্তর্গত।

৩.৩.৪। উৎরাইল গ্রাম

যে গ্রামকে কেন্দ্র করে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে সে গ্রামটির নাম উৎরাইল। উৎরাইল গ্রামটি নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর থানার বিরিসিরি ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গ্রামটি সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামটির সীমানা উত্তরে দক্ষিণ ভবানীপুর এবং ঘরীহাট গ্রাম, পূর্ব দিকে পূর্ব কানিয়াল এবং তেলুনজিয়া গ্রাম, পশ্চিমে সোমেশ্বরী নদী ও বড়ইপাড়া গ্রাম এবং দক্ষিণ দিকে গোয়ালিদেও গ্রাম দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই গ্রামটি দূর্গাপুর সদর থানা কার্যালয় থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

উৎরাইল গ্রামের আয়তন ১৬৭ একর। মোট জনসংখ্যা ৬২১ জন। স্বাক্ষরতার হার ৫১.৪%। সুদূর অতীত থেকেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গারো আদিবাসীগোষ্ঠী এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। এমনকি সমগ্র নেত্রকোণা জেলায় যে তিনজন সাংসারেক গারো আছেন তারাও

Dhaka University Institutional Repository

উৎরাইল গ্রামের অধিবাসী। এই গ্রামের কিছু অংশ পৌরসভার অন্তর্গত তা হলেও গ্রামের মাত্র ৫০ ভাগ এলাকায় বৈদ্যুতিক সুবিধা রয়েছে।

এই গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৭৯ সালে। এছাড়াও ওয়াই, এম,স,এ, তাঁত এবং কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। গ্রামের অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা ভোগ করছে। ওয়াই,এম,সি,এ এখানে একটি বিশ্রামাগার স্থাপন করেছে। এই গ্রামে দু'টি চার্চ, একটি প্রটেষ্টান এবং অন্যটি ব্যাপটিষ্ট। জারিয়া-দূর্গাপুর সড়কের পাশে এই গ্রামে একটি বাজার গড়ে উঠেছে যা স্থানীয়ভাবে গারো বাজার নামে পরিচিত। ব্র্যাক, গ্রামীন ব্যাংক, কারিতাস, সিসিডিবি, ওয়াই, এম,সি,এ,ওয়াই,ডব্লিউ.সি.এ প্রভৃতি বেসরকারী সংস্থাসমূহের অনেক কার্যক্রম এ গ্রামে পরিচালনা হচ্ছে। উৎরাইল গ্রামের বেশীরভাগ অংশই চাষযোগ্য। মাটির ধরন কিছুটা খয়েরী রং এর পাহাড়ী মাটি, মাটিতে প্রচুর অম্ল রয়েছে (বাপ.জ, ১৯৯১)। উৎরাইল গ্রামের জলবায়ু সমগ্র বাংলাদেশের অনুরূপ যা গ্রীষ্মমন্ডলীয় উষ্ণ জলবায়ু। ১৯৯৯-২০০১ সালের বার্ষিক তাপমাত্রা ছিল ৩৭° সে থেকে ৭.৫° মেসঃ এর মধ্যে। (বা.প.জ, ২০০১)। জানুয়ারী মাসে সর্বনিম্ন এবং এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায়। বার্ষিক আদ্রতা ৪০% । বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১,৯৯৭ থেকে ৩,৪৫৪ মিঃমিঃ (গড় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় জুন থেকে অগাষ্ট)।

এই গ্রামটি উদ্ভিজ সম্পদ এবং প্রাণীজ সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রায় সব ধরনের গৃহপালিত প্রাণী এই গ্রামে আছে যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। যেসব বৃক্ষ এই গ্রামে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে কড়ই, শিমুল, বাঁশ এবং কাঁঠাল গাছ। ফলজ বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে আম, কাঠাল, কলা, পেয়ারা, পেপে এবং আনারস প্রভৃতি।

দূর্গাপুর থানা সদরে যাওয়ার প্রধান সড়কটি এই গ্রামের একপাশে দিয়ে প্রদক্ষিন করায় যাতায়াত এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে উৎরাইল গ্রামটি একটি বিশেস সুবিধাজনক অবস্থায় বিরাজ করছে। এখানকার প্রধান পাকা সড়কটি (ইটের তৈরী পিচঢালা পথ) এই গ্রামকে অন্যান্য গ্রামের সাথে যুক্ত করেছে। গ্রামের প্রধান যানবাহনের মধ্যে রয়েছে রিকশা, মটর সাইকেল, বাইসাইকেল, বাস, অটোরিক্সা, মাইক্রোবাস, জিপ, গরু এবং ঘোড়ার গাড়ি অন্যতম। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাও এই গ্রামে আছে।

উৎরাইল গ্রামের অধিবাসীরা এই গ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। যাহোক সুদূর অতীত থেকেই এই গ্রামটি অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্তর্গত। জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় এই গ্রামটি স্থানীয় জমিদারের অধীনে আসে। জমিদার প্রথার আগে এই গ্রামে গারো ছাড়া আর কোন জনগোষ্ঠী বসবাস করতো না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক অস্থিরতা এবং ভারত-

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান যুদ্ধের পর বিভিন্ন স্থান থেকে অন্যান্য লোকজন সরকারের সহযোগিতায় এখানে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

এই গ্রামের মোট অধিবাসীরা সংখ্যা ৬২১ জন এরমধ্যে ৫৬০ জন গারো আদিবাসী(পুরুষ ২৭৮ জন এবং মহিলা ২৮২ জন), ৩১ জন খৃষ্টান যাদের অধিকাংশই খৃষ্টান মিশনারী, ২১ জন হিন্দু এবং ৯ জন মুসলমান। গ্রামে মোট গারো গৃহস্থালীর সংখ্যা ১১৪টি। গৃহস্থালী প্রধানকে নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এদের মধ্যে ৪৪ জন পুরুষ এবং ১৩ জন মহিলা।

উৎরাইল গ্রামের গৃহস্থালী প্রধানদের সম্পর্কিত কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হলো।

সারণী-২: গৃহস্থালী প্রধানদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২১-২৫	৬	১০.৫
২৬-৩০	১২	২১.০
৩১-৩৫	১১	১৯.৩
৩৬-৪০	৮	১৪.০
৪১-৪৫	৭	১২.৩
৪৬-৫০	৩	৫.৩
৫১-৫৫	১	১.৮
৫৬-৬০	২	৩.৫
৬১-উর্দ্ধে	৭	১২.৩
মোট	**৫৭**	**১০০%**

উৎরাইল গ্রামের গৃহস্থালী প্রধানদের বয়সসীমা দেখানো হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে ২৬ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে রয়েছেন ১২ জন যা শতকরা ২১%। এটাই সর্বাধিক সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। এরপর রয়েছে ৩১ থেকে ৩৫ বয়সসীমার মধ্যে ১১ জন গৃহস্থালী প্রধান যা শতকরা ১৯.৩%। ৫১ থেকে ৫৫ বয়স সীমার মধ্যে রয়েছে ১ জন গৃহস্থালী প্রধান যা ১.৮%। এটা সবচেয়ে কম। গৃহস্থালী প্রধানদের বয়স সীমার শুরু হয়েছে ২১ থেকে ৬১ বছরের উর্দ্ধে। গ্রামের এই গৃহস্থালী প্রধানরা সবাই কর্মক্ষম।

সারণী-৩: গৃহস্থালী প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বিবাহিত	৪৩	৭৫.০
বিধবা/বিপত্নীক	১০	১৮.৫
বিচ্ছেদপ্রাপ্ত	৪	৭.০
মোট =	**৫৭**	**১০০%**

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থালী প্রধানদের বৈবাহিক অবস্থাকে নির্দেশ করছে। মোট ৫৭ জন গৃহস্থালী প্রধান এর মধ্যে ৪৩ জন বিবাহিত যা ৭৫%। এবং সংখ্যায় সর্বাধিক। বিধবা এবং বিপত্নীক ১০ জন যা ১৮.৫%। এবং বিচ্ছেপ্রাপ্ত ৪ জন ৭.০% যা সংখ্যাগতভাবে সবচেয়ে কম।

সারণী-৪: গৃহস্থালী প্রধানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রাথমিক	২২	৩৮.৬
মাধ্যমিক	১৯	৩৩.৩
উচ্চ মাধ্যমিক	৯	১৬.০
উচ্চশিক্ষা/স্নাতকোত্তর	৭	১২.৩
মোট =	৫৭	১০০%

এই গ্রামের প্রায় সবাই স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। গৃহস্থালডী প্রধানদের মধ্যে ২২ জন প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন যা শতকরা ৩৮.৬% এবং এই সংখ্যাটি সর্বাধিক সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্ত ১৯ জন যা ৩৩.৩%। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ৯ জন যা ১৬.৩%। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেছেন ৭ জন যা ১২.৩% এটাই সবচেয়ে কম সংখ্যা। এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য গ্রহস্থালী প্রধানদের সবাই শিক্ষিত।

সারণী-৫: এই গ্রামর গারো জনগোষ্ঠীর বয়স এবং লিঙ্গভিত্তিক তথ্যচিত্র

বয়সসীমা	পুরুষ		মহিলা		উভয়	শতকরা(%)
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা(%)		
০-৫	২৭	৯.৭	১৫	৫.৩	৪২	৭.৩
৬-১০	৪২	১৫.১	৩৮	১৩.৫	৮০	১৪.৫
১১-১৫	২৯	১০.৪	২৫	৮.৮	৫৪	৯.৬
১৬-২০	৩৫	১২.৬	৪৩	১৫.২	৭৮	১৩.০
২১-২৫	২৫	১৫.৬	৪৪	১৫.৬	৬৯	১২.৩
২৬-৩০	৫০	১৮.৫	৪৮	১৭	৯৮	১৭.৫
৩১-৩৫	২১	৭.৬	২৬	৯.২	৪৭	৮.৪
৩৬-৪০	১৪	৫.০	১৫	৫.৩	২৯	৫.২
৪১-৪৫	১৪	৫.০	২	০.৭	১৬	২.৮
৪৬-৫০	৪	১.৪	৬	২.১	১০	১.৮
৫১-৫৫	৫	১.৮	৬	২.১	১১	১.৯
৫৬-৬০	২	০.৭	৪	১.৪	৬	১.১
৬১-উর্দ্ধে	১০	৩.৬	১০	৩.৫	২০	৩.৬
মোট	২৭৮	১০০%	২৮২	১০০%	৫৬০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

উৎরাইল গ্রামের গারো জনগোষ্ঠীর বয়স এবং লিঙ্গভিত্তিক একটি তথ্য চিত্র পাওয়া গিয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে গ্রামের মোট পুরুষের সংখ্যা ২৭৮ জন এবং মহিলার সংখ্যা ২৮২ জন। মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী। ২৬ থেকে ৩০ বৎসরের বয়স সীমার মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা ৯৮ জন যা ১৭.৫% এর মধ্যে ৫০ জন পুরুষ ১৮.৫% এবং ৪৮ জন মহিলা ১৭% এটাই সর্বাধিক সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। ৫৬ থেকে ৬০ বৎসরের সীমার মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে কম সংখ্যাক অধিবাসী এই অধিবাসী সংখ্যা ৭ জন ১.১% যার মধ্যে ২ জন পুরুষ ০.৭% এবং ৪ জন মহিলা ১.৪%। উৎরাইল গ্রামের অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশই কর্মক্ষম।

এই গ্রামের গারোরা প্রধানত ৩টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই গোষ্ঠীসমূহের আরও উপবিভাগ আছে যাকে "মাচং" বলা হয়। কিছু কিছু মাচং সমাজ জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে যেমন চামড়ুগং, মোরং, দোপো, ম্যাংস্যাং ইত্যাদি। প্রতিটি মাচং এর আবার আরও ক্ষুদ্র বিভাগ রয়েছে যাকে "মাহারী" বলা হয়। অধিকাংশ সময় একই মাহারীর অন্তর্ভূক্ত সদস্যরা একইসাথে বসবাস করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে মাহারীর সদস্যরা আলাদাভাবে অন্যত্র বসবাস করতে শুরু করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

গারো আদিনিবাস, নামকরণ এবং আবাসের ধরন

এই অধ্যায়ে গারোদের উৎপত্তি ও আদিনিবাস, গারো নামকরণ, ভাষার উৎপত্তি ও আবাসের ধরণ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১. উৎপত্তি

গারোদের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য এখনও জানা যায়নি। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন মংগোলীয় জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি হিসাবে পরিচিত চীনের উল্টর সিন-কিয়াং প্রদেশে গারোদের আদিনিবাস ছিল। গারোরা মূলতঃ "টিবেত চাইনিজ" (Tibeto-chinese) পরিবারের "টিবে-বার্মীজ" নরগোষ্ঠী যাদের আদিনিবাস ছিল চীনের উল্টর পশ্চিমাঞ্চলের ইয়াং-সিকিয়াং এবং হোয়াংহো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। (Imperial Gazetter of India, 1909:504)। পরবর্তীতে তারা তিব্বতের উল্টর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা হয় যে তিব্বতে গারোরা দীর্ঘদিন বসবাস করেছিল। কারণ বর্তমান কালেও দেখা যায় গারোদের সাথে তিব্বতীয়দের কথ্য ভাষা, সংস্কার এবং ঐতিহ্যগত রীতিনীতিতে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে গারোদের আগমন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। গারো লোককাহিনী অনুসারে জানা যায়, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে গারোদের পূর্বপুরুষদের একটি দল জাপকা-জালিনফা এবং সুখাকাবোংগিক নামক দুই নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তিব্বত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তারা কোচবিহার অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় গোলযোগের জন্য এই অঞ্চল পরিত্যাগ করে নতুন জায়গার সন্ধানে পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করে। এই যাত্রাকালে তারা বর্তমান গোয়ালপাড়ার বাঙ্গামাটিতে সাময়িকভাবে বসবাস করে। পরবর্তীকালে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর বরাবর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে আসামের কামরূপ অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে এবং পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী ক্রমান্বয়ে অঞ্চল সমূহে ছড়িয়ে পরে।

অনুমান করা হয় বিভিন্ন সময়ে ভারতের মেঘালয়ে অবস্থিত গারো পাহাড় থেকে এসে গারোরা পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে বসবাস শুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উর্বর এবং চাষযোগ্য জমির খোঁজে তারা বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার অর্ন্তগত মধুপুরের বনাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয় এবং বসতি স্থাপন করে বলে মনে করা হয় (খালেক, ১৯৮৩ঃ৯৩)।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব গারো বসবাস করছে তাদের পূর্বপুরুষ গারো পাহাড় থেকে এদেশে আগমন করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। নাকনা মনে করেন যে গারো পাহাড় থেকে এসে গারোরা বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পরে। (নাকনা, ১৯৬৭ঃ৭৯)।

সুভাষ জেংচাম এর মতানুসারে আনুমানিক ৯ম এবং ১০ম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর সীমানা বরাবর গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমি এলাকায় গারোরা বসতি স্থাপন শুরু করে এবং বিভিন্ন দলনেতার নেতৃত্বে বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। এর ঐতিহাসিক প্রমান পাওয়া যায় সুসং দুর্গাপুরে স্বাধীন গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণে। তাদের এই বসতি স্থাপনের বিস্তৃতি বাংলাদেশে মোঘলদের প্রত্যক্ষ শাসনের আগ পর্যন্ত বজায় ছিল। পরবর্তীতে মোঘল প্রভাব যখন এদেশে চরমে পৌছায় এবং বহিরাগতরা যখন এই এলাকায় বসবাস শুরু করে তখন গারোরা ক্রমান্বয়ে পিছাতে বাধ্য হয় অর্থ্যাৎ উত্তর দিকে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনামলে তাদের বাসস্থান সংকুচিত হয়ে প্রায় বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছায় (জেংচাম, ১৯৯৪ঃ৬৭)।

৪.১। নামকরণ

গারো নামকরণের সঠিক কোন কারণ, এবং কাল জানা যায় নি। অনেকে মনে করেন গারো পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান বাংলাদেশের সীমানার কাছে গারোদের অন্যতম শাখা গরা-গানচিংয়ের ব্যাপক বসতি ছিল। বাংলাদেশের সাধারন মানুষ এই শাখার নামানুসারে তাদের সমম্বোধন করতে থাকে এবং কালক্রমে সম্বোধনটি গারোতে পরিনত হয়। আবার অনেকে মনে করেন মধ্যযুগে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের হিন্দু জমিদাররা যখন গারোদের বশ্যতা আদায়ের জন্য সমতল এলাকায় অবস্থিত হাট-বাজারে আসা যাওয়া বন্ধ করে দেয় তখন পাহাড়ী গারোরা প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে সীমান্তবর্তী সমতল অঞ্চলে অতর্কীত সশস্ত্র আক্রমন করে পালিয়ে যেত। এভাবে তারা হিন্দু জমিরদারদেরকে সব সময় ব্যস্ত রাখেতে সচেষ্ট হয়। ফলে জমিদাররা তাদেরকে "ঘারুয়া" (একরোখা) জাত নামে ডাকতে শুরু করে। কালক্রমে "ঘারুয়াই" গারোতে পরিণত হয়। বৃটিশরা প্রথমদিকে গারুয়ার (Gharowa) অনুকরণে গারোদের লিখতেন।

তবে গারোরা কোন দিনই গারো নামে অভিহিত হতে পছন্দ করে নি এবং এখনও করে না। গারো নামটি প্রচলিত এবং আর্ন্তজাতিক হিসাবে গৃহীত হওয়ায় তারা অনেকটা বাধ্য হয়েই এই নামটি মেনে নিয়েছে। গারোরা নিজেদের "আচিক মান্দে" (পাহাড়ের মানুষ) এবং সংক্ষিপ্তভাবে শুধু "আচিক" বলে পরিচয় দিতে বেশী পছন্দ করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় যেমন শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা জেলার গারোরা নিজেদের "মান্দি" বলে পরিচয় দেয়। আবার টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল ও সখীপুর অঞ্চলের গারোরা "মানদাই" নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

গারোরা মূলত: দুই প্রকার; প্রথমত পাহাড়ী গারো (আচিক মান্দে) এবং দ্বিতীয়ত: সমতলীয় গারো (লামদানী মান্দে)। যারা পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে তারা পাহাড়ী গারো নামে পরিচিত। জুমচাষ এবং শিকার এদের প্রধান জীবিকা। ভারতের মেঘালয়ে এধরনের গায়ো বেশী দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রধানত সমতলীয় গারোরা বসবাস করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মত সেচভিত্তিক কৃষিকাজই বর্তমানে এদের প্রধান পেশা।

৪.২। ভাষা

গারো জনগোষ্ঠীর স্থানীয় ভাষা "মান্দি ভাষার" তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গারোরা যে ভাষায় কথা বলে তা মূলত: "সিনো-টিবেটান" (Sino-Tibetan) ভাষার অর্ন্তগত "টিবোটো - র্বমান" (Tibeto-Burman) উপ-পরিবারের "আসাম-বার্মা" (Asam-Burma) শাখার অন্ত র্গত "বোডো" "বা" "বরা" (Bodo or Bora) ভাষা উপ-গোষ্ঠীর অর্ন্তগত একটি ভাষা। গারো ভাষা মূলত: কথ্য ভাষা। এদের কোন লিপি বা অক্ষর নেই। বর্তমানে ইংরেজী এবং রোমান হরফেই গারো ভাষার লেখার কাজ চলছে। বাংলাদেশের গারোরা প্রধানত বাংলা এবং ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষা লিখে থাকে।

বাংলাদেশের গারোরা তাদের সর্বজন স্বীকৃত উচ্চাঙ্গ "আচিক" ভাষা ব্যবহার করে না। এর পরিবর্তে তারা তাদের অন্যতম প্রধান "আবেংদলের" কথ্য ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের গারোদের সার্বজনীন কথ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃত "আবেং" ভাষা ছাড়াও গারোরা আঞ্চলিক পর্যায়ে নিজ নিজ গোত্রের ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

৪.৩। গারোদের আবাসের ধরণ:

গারোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত। কিন্তু আমি যে গ্রামে গবেষনাকার্য পরিচালনা করেছি সেখানে সবাই গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী। এমনকি তাদের পূর্বপুরুষরাও এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। ফলে প্রচরনশীল বৈশিষ্ট্যগুলো এদের মধ্যে অনুপস্থিত।

গারোদের গ্রামগুলো গড়ে ওঠে নদী বা ঝরনার তীরবর্তী স্থানে এবং যতটা সম্ভব হিংস্রজন্তুর আবাস্থল থেকে দূরে। গারোদের ঘরগুলো নির্মিত হয় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ বাড়ীঘরের মতো তবে ঘরের বৈশিষ্ট্য এবং নির্মান পদ্ধতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গারোদের ঘরগুলো সাধারণত লম্বায় ত্রিশ থেকে দেড়শ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ এবং দশ থেকে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে তাদের সাধারনত দুইটি বাড়ী থাকে; একটি হলো গ্রামে বসতবাড়ি এবং অন্যটি হলো শস্যক্ষেতের আশেপাশে। ভারতের মেঘালয় অঞ্চলের গারোদের মধ্যে সাধারনত এরকম বাড়ী দেখতে পাওয়া যায় (মীরওয়থি, ১৯৯১:৪৪)।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্য অনুসারে গারোদের বাড়ীর সম্মুখ অংশ ঢালু করে নির্মাণ করা হয়। বাড়ীর কাঠামো সাধারনত কাঠের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁশের তৈরী হয়। বাঁশ, মাটি এবং টিন দিয়ে ঘরের চারিদিক বেড়া দেয়া হয়। প্রতিটি বাড়ী উপর এবং নীচ এই দুইভাগে বিভক্ত। উপরের অংশ বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং নীচের অংশে গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া, শুকর ও হাস-মুরগী পালন করা হয় (সাত্তার ১৯৭৭: ২৬)। প্রতিটি বাড়িতেই কয়েকটি কক্ষ থাকে। প্রতিটি কক্ষ ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় যেমন যুদ্ধাস্ত্র, ও চাষাবাদের যন্ত্রপাতি রাখার কক্ষ, খাবার কক্ষ ইত্যাদি। প্রতিটি বাড়ীর সম্মুখে উঠান এবং বারান্দা থাকা অপরিহার্য। বাড়ীর গোলাঘর থাকে একপাশে যা দেখতে অনেকটা প্যাগোডার মত এবং খুবই সুদৃশ্য।

৪.৫। গারোদের বর্তমান গৃহস্থালীর ধরন

গারোদের ঐতিহ্যবাহী গৃহস্থালী নির্মানে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে গারোদের বাসগৃহ বাঙ্গালীদের মত। তবে কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা শন, খড়, টিন দিয়ে বাসগৃহের ছাউনি দিয়ে থাকে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, বসার ঘর আলাদা করা থাকে। বাশ বা টিন দিয়ে বেড়া দিতে না পারলে গাছ লাগিয়ে তারা বেড়া দেয়। বসতবাড়ীর চারপাশে বিভিন্নরকম ফুল এবং ফলের গাছ লাগায়। বাড়ীর আঙ্গিনায় বিভিন্ন শাক-সবজির চাষ করে থাকে। এখনও গারোরা শন বা খড়ের সাহায্যে ঘরের ছাউনী দেওয়ার সময় বাঁধার কাজে পাটের সুতলি ব্যবহার কিংবা দড়ি ব্যবহার করে না। এর পরিবর্তে বাঁশের পাতলা চটি ব্যবহার করে, যা তারা নিজেরা তৈরী করে। আগে তাদের ঘর উপর এবং নীচ এই দুটি ভাগে বিভক্ত থাকত। এখন সেটা খুব কম দেখা যায়। বাড়ীর পিছন দিকে বা ঘরসংলগ্ন হাস-মুরগীর ঘর থাকে। একপাশে মাচান বেধে রান্নাকরার জন্য লাকড়ী রাখা হয় এবং এর সাথেই থাকে রান্নাঘর। সবই মূল ঘরের সংলগ্ন থাকে। দেখে মনে হয় এগুলো সবই মূল ঘরটির বর্ধিত অংশ। প্রায় প্রতিটি গৃস্থালিতে শুকর দেখা যায়। শুকর নোংরা করে বলে একে একটু দুরে ঘের দিয়ে আলাদা জায়গায় রাখা হয়। এখানে একটা জিনিস খুবই লক্ষ্য করার মত যে গারোদের বসতবাড়ী এবং তার আশপাশ খুবই পরিস্কার। আমি সবসময় লক্ষ্য করেছি যে তাদের আসবাবপত্র, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, কাপড়চোপড় সবই অত্যন্ত গোছানো এবং পরিস্কার থাকে। গারো ভাষায় বাড়ীকে বলা হয় "নক"। সাধারণত নকের সদস্যরা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানরা। মাতৃস্থানীয় পরিবারে কোন কোন সময় জামাতা "নক" এর অর্ন্তভূক্ত হয়। বৃহত্তর অর্থে নক হচ্ছে একটি ঘর, সেটা কুড়ে ঘর বা টিনের ও হতে পারে, সেখানে একটি পরিবার বাস করে এবং একসাথে,খেয়ে থাকে যাকে আমরা গৃহস্থালী হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ৬ গারো গৃহস্থালীর ধরণ

স্থান সংকুলান	সংখ্যা	শতকরা
একটা ঘর (শোবার কক্ষ +রান্নাঘর+ অন্যান্য)	৩৫	৬১.৪%
একটা ঘর (২টা শোবার কক্ষ+রান্নাঘর+ অন্যান্য)	২২	৩৮.৬%
মোট	৫৭	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায় জরীপ ২০০৫

সারনী- ৬ দেখা যাচ্ছে যে, শোবার ঘর, রান্না ঘর ও অন্যান্যসহ একটা ঘরে বসবাস করে ৩৫টি পরিবার। ২টি শোবার ঘর, রান্না ঘর এবং অন্যান্যসহ ১টি ঘরে বসবাস করে ২২টি পরিবার। যা শতকরা ৩৮.৬। গারোদের গ্রহস্থালী আবার বিভিন্ন ধরনের সুবিধা সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। নীচে সারনী ..... অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধাসহ এই গ্রামের গারো গৃহস্থালীর অবস্থা তুলে ধরা হলো।

অন্যান্য সুবিধাসহ এই গ্রামের গারো গৃস্থালি। (মোট গৃহস্থালী সংখ্যা-৫৭)

সারনী-৭

অন্যান্য সুবিধা সমূহ	সংখ্যা	শতকরা
রান্নাঘর	২১	৩৬.৮%
ভিতরের খোলা জায়গা (উঠান)	৩৬	৬৩.২%
বাহিরের খোলা জায়গা (উঠান)	৪১	৭২.০%
বাহিরে এবং ভিতরে খোলা জায়গা	৫	৮.৮%

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আলাদা রান্না ঘর আছে ২১টি পরিবারের। ভিতরে খোলা জায়গা বা উঠান আছে ৩৬টি পরিবারের। বাইরের খোলা জায়গা আছে ৪১টি পরিবারের। বাইরে ও ভিতরে খোলা জায়গা আছে ৫টি পরিবারের।

গারো গৃহস্থালী মূলত আর্থ-সামাজিক জীবনের একক। গৃহাস্থালীগুলো গারোদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও প্রতিটি গৃহস্থালী তাদের সামাজিক মর্যদার পরিচয় হন করে। মোট ৫৭টি গৃস্থালী তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিচয় বহন করে। সারনী ৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, মোট ৫৭ গৃহস্থালী মধ্যে ৩৫টি (৬১.৪% বাড়ীর ১টি শোবার ঘর এবং রান্নাঘর রয়েছে, ২২টি (৩৮.৬%) বাড়ীর ২টি শোবার ঘর সহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে। সারনী ৭ এ দেখা যাচ্ছে ২১টি (৩৬.৮%) বাড়ীর আলাদা রান্নাঘর রয়েছে। ঘরের সামনের ঢালু চালটি বাঁশ, কাঠ এবং অনেক ক্ষেত্রে কংক্রিটের খুটির সাহায্যে বর্ধিত করা হয়েছে। এটা প্রায়ই বারান্দা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩৬টি গৃহস্থালীতে ৩ থেকে ৫ ফুট প্রশস্ত এবং ৬ থেকে ১০ ফুট লম্বা বারান্দা রয়েছে। ৪১টি

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীতে (৭২.০%) ১৫ থেকে ২৫ ফুট লম্বা এবং ১০ থেকে ২০ ফুট পাশে উঠান রয়েছে। এই জায়গাটি সাধারনত শস্যশুকানো, বাচ্চাদের খেলাধুলা, একসাথে বসে গল্প করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। গরমের সময় এই খোলা জায়গায় বিভিন্ন গাছের নীচে ছায়ায় বসে মানুষ বিশ্রাম নেয়। ৫৭টি বাড়ীর মধ্যে মাত্র ৫টি বাড়ীতে (৮.৮%) বারান্দা এবং উঠান দুই আছে। অবস্থাসম্পন্ন গারোরা বাচ্চাদের এবং মেহমানদের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করে যা স্থানীয়ভাবে "নকপান্তে" নামে পরিচিত।

গৃহস্থালী নির্মাণে বিনিয়োগ এবং মালিকানাসহ ঐতিহ্যবাহী গারো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার এবং মালিকানা দুটোই মাতৃবংশ নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নগারায়ন, শিল্পায়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তন, প্রভৃতি কারণ তাদের মাতৃবংশীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। নীচের সারনী-..... এ গারো গৃহস্থালীর নির্মাণে বিনিয়োগ এবং মালিকানা সংক্রান্ত গারোদের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো।

সারনী- ৮ গারোর গৃহস্থালী নির্মাণে বিনিয়োগ এবং মালিকানা

ক্রমিক নং	বিনিয়োগ এবং গৃস্থালীর মালিক	সংখ্যা	শতকরা
১.	স্ত্রী নির্মাতা স্বামী মালিক	৩	৫.৩%
২.	স্ত্রী নির্মাতা, বা বিনিয়োগকারী স্ত্রী মালিক	৮	১৪.০%
৩.	স্বামী বিনিয়োগকারী, স্বামীই মালিক	৩০	৫২.৬%
৪.	মা বিনিয়োগকারী, নোকনা মালিক	২	৩.৫%
৫.	বাবা বিনিয়োগকারী, নোকনা মালিক	২	৩.৫%
৬.	বাবা এবং মা বিনিয়োগকারী নোকনা মালিক	১	১.৮%
৭.	স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই বিনিয়োগকারী উভয়েই মালিক	১১	১৯.৩%
	মোট	৫৭	১০০%

একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, বিনিয়োগকারী, নির্মাতা এবং মালিক এই প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীদের সংখ্যা ৩০জন (৫২.৬%)। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জমির মালিক হচ্ছে স্ত্রী যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। কিন্তু স্ত্রীর জমিতে স্বামী বাড়ী নির্মাণ করে একত্রে বসবাস করছেন এদের সংখ্যা ৩ জন (৫.৩%)। ৮টি গৃহস্থালীর (১০.০%) নির্মাতা এবং বিনিয়োগকারী স্ত্রী এবং তিনি নিজেই মালিক। ১১টি গৃহস্থালীর (১৯.৩%) নির্মাতা, বিনিয়োগকারী এবং মালিক যৌথভাবে স্বামী-স্ত্রী। ঐতিহ্যবাহী প্রথায় ২টি করে মোট ৪টি গৃহস্থালী পাওয়া গেছে যা নির্মাণ করেছিলেন পিতা বা মাতা এবং নোকনা স্বত্তাধিকার সূত্রে মালিক হয়েছেন। আর ১টি গৃহস্থালী (১.৮%) নির্মাণে বিনিয়োগকারী বাবা এবং মা উভয়ই কিন্তু মালিক হয়েছেন নোকনা।

Dhaka University Institutional Repository

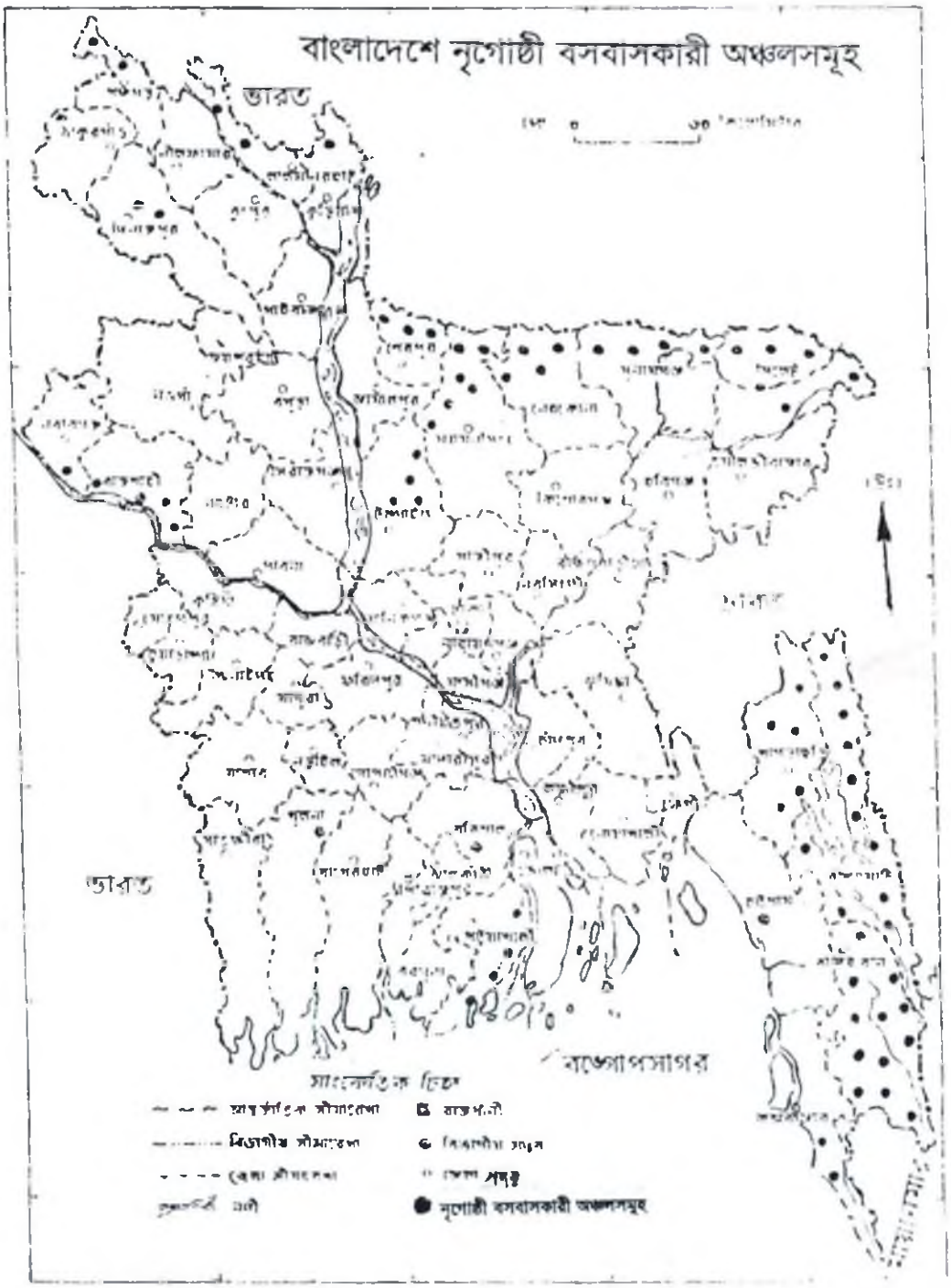

Dhaka University Institutional Repository

উৎরাইল গ্রামের মানচিত্র

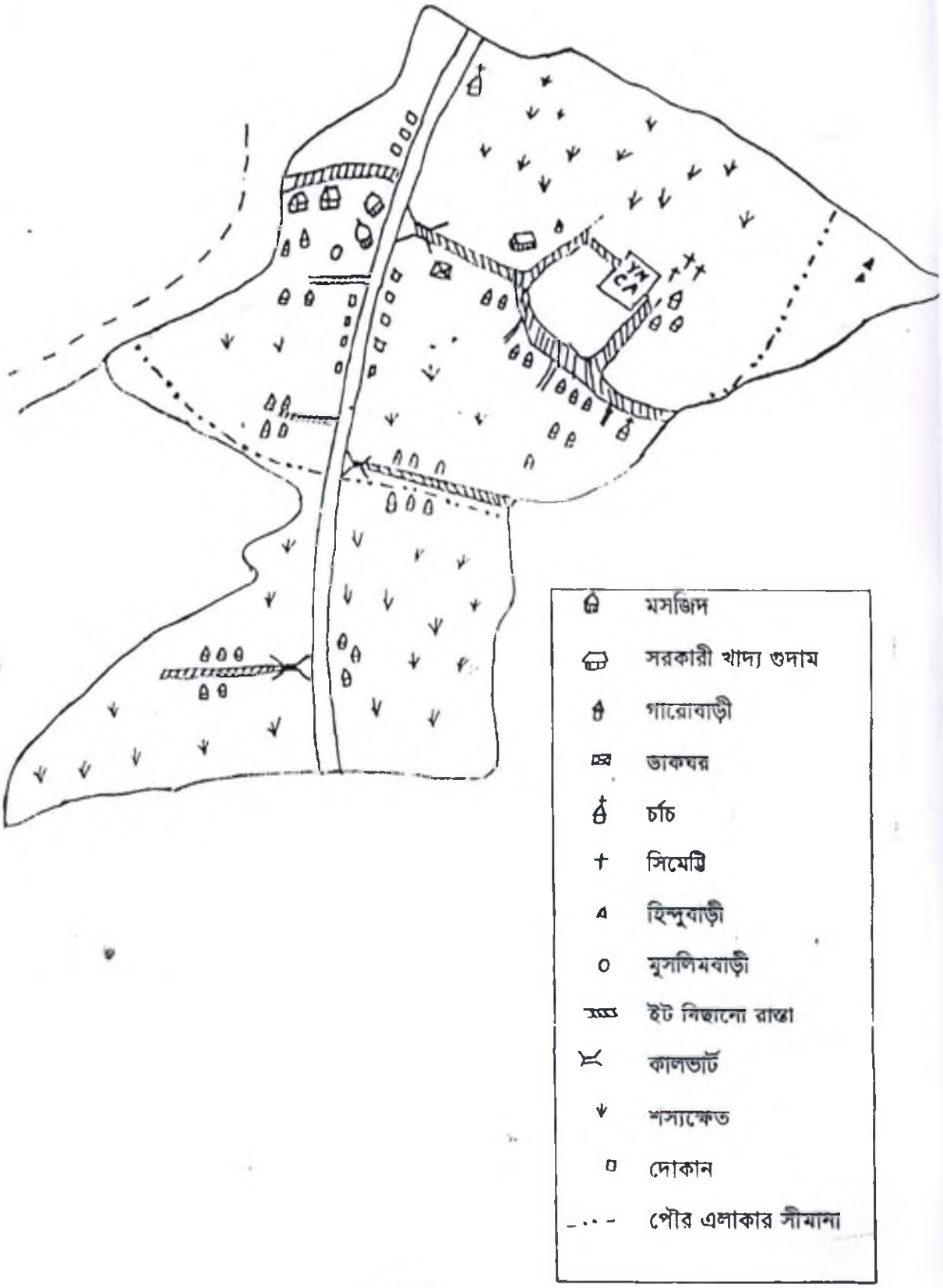

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

সামাজিক সংগঠন

প্রতিটি সমাজেই একটি সামাজিক সংগটন আছে। একে সমাজকাঠামোর মূল উপাদান বলা যায়। সাধারণত জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক সংগঠন সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সামাজিক সংগঠনের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে বিয়ের মাধ্যমে একটি পরিবার গঠিত হয়। পরিবার থেকে বৃহত্তর পরিবার ক্রমান্বয়ে গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর সমাজ গঠিত হয়।

৫.১। বিয়ে (Marriage)

সামাজিক সংগঠনের অন্যতম প্রধান প্রত্যয় হচ্ছে বিয়ে (Marriage)। সনাতনভাবে অধিকাংশ সমাজের দৃষ্টিতে বিয়ে হচ্ছে দুটি সম্পর্কের মধ্যে একটি সামাজিক এবং আইনগত বন্ধন। এই বন্ধন বা চুক্তি বিবাহিত দম্পতির একপক্ষ বা উভয়পক্ষের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে। বিবাহিত সম্পর্কের আর একটি দিক হচ্ছে সমাজ স্বীকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তির উপর অধিকার এবং তাদের প্রতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পারিক বিনিময় এবং আদান প্রদান" (Williams, 1990: 269)

বিয়েয় সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী উইলিয়াম এন ষ্টিভেন্স বলেন, "Marriage merely means a socially approved sexual and economic union between a woman and a man. It is presumed, both by the couple and by other, to bc more or less permanent and it subsumes reciprocal rights and obligations between the two spouses and between spouses and their future children" (Stephens, 1963:5)।

সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বিয়ে একটি সমাজের কতগুলো নির্দিষ্ট নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন সামাজিক কর্তব্য, অধিকার, বিবাহিত ব্যক্তির আইনগত সুরক্ষা। (Williams, 1990:268)।

Mihanovich, Schnapps, এবং Thomas তাদের "Marriage and the Family গ্রন্থে বিয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "Marriage may be defined as The status or relation of man and a woman who have been legally united as husband and wife" (Mihanovich, Schnepp & Thomas, 1952: 229) ।

বিয়ে কতগুলো সামাজিক প্রথার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই সামাজিক প্রথাগুলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক, সর্বোপরী গোটা সমাজের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নিয়ন্ত্রণ করে। হোবেল এ প্রসঙ্গে বলেন "Marriage is the Complex of

Dhaka University Institutional Repository

social norms that define and Control the relations of connubial pair to eacjh other their kinsmin, their offspring and society at large" (Hobel, 1960: 332) কাজেই বিয়ে একটি আনুষ্ঠানিকতা যার মাধ্যমে সমাজ নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক এবং তাদের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে (নকী রহমান, ১৯৮৮: ১২৫)।

৫.১.১। গারো সমাজে বিয়ে :

পৃথিবীর সব সমাজের মত গারো সমাজেও বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের মাধ্যমে গারো সমাজ নারী-পুরুষের শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। গারো সমাজে বিয়ে একটি নতুন পরিবারের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

গারো সমাজ কাঠামো মূলত: মাতৃতান্ত্রিক। বিয়ের ক্ষেত্রে তারা বহি:গোষ্ঠী রীতি মেনে চলে। গারো সমাজে একই গোত্রভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিবাহ নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি শুধু তার ক্রস কাজিনকে (ফুফাত,মামাত) বিয়ে করতে পারে। অন্যদিকে খালেক (১৯৮৩) বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে প্যারালাল এবং ক্রস উভয় ধরনের বৈবাহিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন।

গারো সামাজিক অনুশাসন অনুসারে অন্ত:গোষ্ঠী বিবাহ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ রকম বিয়ে মাকে বিয়ে করার সমতুল্য অর্থাৎ "মা-ডং" (মা-মাতা এবং ডং একসাথে বসবাস)। একই গোষ্ঠীতে বিয়ে "মারাং" পাপ বলে বিবেচিত। যদি কেউ এরকম করে থাকে তবে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গ্রাম থেকে নির্বাসিত করা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে গারো উত্তরাধিকার ব্যবস্থার উপর বিয়ের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সম্পত্তি উত্তরাধিকার যেহেতু মাতৃসূত্রীয় সেহেতু সন্তানদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে মা অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকে। বিয়ের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে উভয় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বিয়ে দিন ধার্য করা হয় এবং নির্দিষ্ট সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে বিয়ে হয়। বিয়ের পর মাতৃবাসরীতি গারোদের অন্যতম প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য। গারোদের বৈবাহিক রীতি "কিম" নামে পরিচিত। গারো "কিম" অনুসারে কোন পুরুষ ও মহিলা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা আজীবন অক্ষুন্ন থাকে এমনকি সেই ব্যক্তির মৃত্যু হলে বা অন্যত্র চলে গেলে তার সঙ্গী (স্বামী/স্ত্রী) খোঁজার দায়িত্ব "মাহারী" এবং "মাচং" এর উপর অর্থাৎ ঐ গোত্রের উপর ন্যস্ত থাকে। বাংলাদেশের গারোদের মধ্যে দুই ধরনের বিয়ে লক্ষ্য করা যায়; যথা নোকরম বিয়ে ও এগেইট বিয়ে।

ঐতিহ্যগতভাবে গারো সমাজে যে কন্যা (কনিষ্ঠা) মাতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অর্জন করে তাকে "নোকমা" (পরিবারের ভিত্তি) বলা হয়। নোকমার পিতামাতা নোকমার জন্য পাত্র বা স্বামী পছন্দ করে। সাধারনত ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্য থেকে নোকমার স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

পছন্দ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পিতা তার বোনের ছেলেকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নোকমার স্বামীকে নোকরম (পরিবারের স্তম্ভ) বলা হয়। বিয়ের পর নোকমা বাবা-মার বাড়ীতেই সাধারনত বসবাস করে। বৃদ্ধ বয়সে নোকমার পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করার দায়িত্ব নোকমা-নোকরম দম্পত্তির উপর ন্যস্ত থাকে। নোকরম যখন গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহন করে তখন সে আর্থ-সামাজিকভাবে সবচেয়ে সম্মানজনক অবস্থায় অবস্থান করে। সে কারনেই নোকরম বিয়েতে ক্রস-কাজিন বিয়ে অধিকতর গুরুত্ব পায়।

এগেইট বিয়ের শাব্দিক অর্থ অ-উত্তরাধিকারী কন্যার বিয়ে। এগেইট বিয়েতে কন্যা স্থায়ীভাবে পিতা-মাতার গৃহে বসবাস করতে পারে না। বিয়ের পর এগেইটকে তার পিতা-মাতার গৃহে কিছুদিন (এক বা দুই বছর) বসবাস করার পর নতুন বাড়ী তৈরী করে অন্যত্র চলে যেতে হয়। এক্ষেত্রে বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার সেবাযত্ন করার কোন দায়িত্ব থাকে না।

৫.১.২। বিয়ের স্থান:

পাত্র পাত্রী নির্বাচনের পর কনের বাড়ীতে "কামাল" (পুরোহিত) ডেকে বিয়ের দিন ও তারিখ ধার্য করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে দু'টি মোরগ মুরগী বলী দেয়া হয়। হলুদ তেল দিয়ে বর- কনেকে গোসল করানোর পর নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে বসিয়ে মন্ত্রপাঠের মধ্যে দিয়ে বিয়ে সমাধা হয়। বিয়ের পর বর কনের বাড়ীতে চলে আসে।

৫.১.৩। বিয়ের অনুষ্ঠান:

ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে দুই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠান পালিত হয়; যথা :ক) দোসিয়া বিয়ে, খ) বলপূর্বক বিয়ে।

গারোদের মধ্যে "দোসিয়া বিয়ে" সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। দু'টি ভিন্ন গোত্রের মধ্যে কনে এবং বর নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচনে বর-কনেসহ পরিবারের সবারই মত থাকে। একটি নির্দিষ্ট দিনে "ধর্মগুরু" (পুরোহিত) দুটি মোরগ- মুরগী উৎসর্গ করে। বর-কনেকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে বসিয়ে স্বামী-স্ত্রী ঘোষণা করে। এরপর অতিথিরা বর-কনেকে তাদের উপহার সামগ্রী প্রদান করে। উপহার ছাড়া কেউ বিয়ের অনুষ্ঠানে সাধারণত আসে না।

বলপূর্বক বিয়েতে কনে তার পছন্দের পাত্রের কথা তার অভিভাবকদের বলে। তখন তার অভিভাবকরা বিশেষ করে বাবা, চাচা, মামা এবং অন্যান্যরা ছেলেটির গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ মত তাকে ধরে মেয়ের বাড়ীতে নিয়ে আসে। কনের বাড়ীতে সে একের অধিক রাত কনের সাথে বসবাস করে। এরপর যদি বর চলে যায় তবে কনের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়রা তাকে আবার নিয়ে আসে। যদি বর আবারও দ্বিতীয়বারের মত চলে যায় তবে তাকে মুক্তি দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়। প্লেফেয়ার এরকম বিয়ের বর্ণণা দিয়েছেন (Playfair 1909.67) উৎরাইল গ্রামের গৃহস্থালী প্রধানদের বৈবাহিক অবস্থার একটি তথ্য নীচের সারনীতে তুলে ধরা হলো

সারনী: ৯ উৎরাইল গ্রামের গৃহস্থালী প্রধানদের বৈবাহিক অবস্থার তথ্য চিত্র

বৈবাহিক অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা
বিবাহিত	৪৩	৭৫.৫%
বিধবা/বিপত্নীক	১০	১৭.৫%
তালাকপ্রাপ্ত	৪	৭.০%
মোট	৫৭	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায় জরীপ ২০০৫ইং

সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রামে বিবাহিত গৃহস্থালী প্রধানের সংখ্যা ৪৩ জন (৭৫.৫%)। বিধবা এবং বিপত্নীকের সংখ্যা ১০ জন (১৭.৫%) এবং তালাকপ্রাপ্ত সংখ্যা ৪জন (৭.০%)।

৫.১.৪। বিয়ের বয়স

ঐতিহ্যগতভাবে গারোরা ছোট বয়সে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে পছন্দ করে। সেটাকে অনেক সময় বাল্য বিবাহ বলা চলে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিয়ের বয়স হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২২ বর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। আইন প্রয়োগের অনুপস্থিতি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবন্ধন না হওয়ায় গারোদের মধ্যে এর প্রভাব খুবই কম।

403638

সারনী- ১০ উৎরাইল গ্রামে গারো অধিবাসীদের বিয়ের অবস্থা দেখানো হলো।

বয়স-সীমা	পুরুষ	শতকরা	মহিলা	শতকরা
১০-১৪	-	২৪.২%	১২	৯.২%
১৫-১৯	৩৪	২৪.২%	৭১	৫০.৮%
২০-২৪	৬৬	৫০.৮%	৫১	৩৩.৮%
২৫-২৯	৩০	২৫%	৮	৬.২%
	১৩০	১০০	১৪২	১০০

উৎস: মাঠ পর্যায় জরীপ- ২০০৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারনী: এ দেখা যাচ্ছে ১০ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে ১২জন (৯.২%) মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে ৩৪ (২৪.২%) পুরুষ এবং ৭১জন (৫০.৮%) মহিলার বিয়ে হচ্ছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সসীমায় ৫১জন (৩৩.৮%) মহিলা বিয়ে করে। ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমায় ৩০জন (২৫%) পুরুষ এবং ৮জন (৬.২%) মহিলা বিয়ে করে। লক্ষ্যণীয় যে অধিকাংশ গারোর ২৫ বছরের মধ্যেই বিয়ে হয় গারো সমাজে নগন্য সংখ্যক দ্বিতীয় বিয়ে সংগঠিত হয় তা সাধারণত ২৫ বৎসরের পরে হয়। দু'একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে উক্ত মেয়েরা কিছুটা পরিবারের অবাধ্য হয়েই একটু দেরীতে বিয়ে করে। নীচের সারনী-১১তে উৎরাইল গ্রামে গারো অধিবাসীদের বর্তমান বৈবাহিক অবস্থার একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো।

সারনী: ১১ উৎরাইল গ্রামে গারো অধিবাসীদের বর্তমান বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	পুরুষ	শতকরা	মহিলা	শতকরা
অবিবাহিত	১৫৫	৬৩৩%	১০৫	৩৯.০%
বিবাহিত	১৩০	৪.৮%	১৪২	৫২.৮%
বিধবা/বিপত্নীক	২	০.৭%	১০	৩.৭%
তালাকপ্রাপ্ত	৪	১.৪%	১২	৪.৫%
মোট	২৯১	১০০%	২৬৯	১০০%

সারনী: ১১ এ দেখা যাচ্ছে ২৯১ জন পুরুষের মধ্যে ১৫৫ জন অবিবাহিত, ১৩০ জন বিবাহিত, বিপত্নীক ২ জন এবং তালাকপ্রাপ্ত ৪ জন। ২৬৯ জন মহিলার মধ্যে অবিবাহিত ১০৫ জন, বিবাহিত ১৪২ জন, বিধবা ১০ জন এবং তালাকপ্রাপ্ত ১২ জন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশী। আর বিবাহিত মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী। আবার বিধবা মহিলার সংখ্যা বিপত্নীক পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। অন্যদিকে তালাকপ্রাপ্ত পুরুষের চেয়ে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা অনেক বেশী।

৫.১.৫। গারো বৈবাহিক জীবনে পরিবর্তনের ধারা

বর্তমান গারো সমাজে বৈবাহিক রীতিনীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহি:বিশ্বের চাপ যেমন ধর্মীয় প্রভাব, বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রভাব, শিক্ষার প্রভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রাসারন, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব, যাতায়াত এবং গনমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং নগর সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি বিষয় গারোদের ঐতিহ্যগত বৈবাহিক রীতি নীতি এবং আচার অনুষ্ঠানে ব্যাপক প্রভাব রাখছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় কারণ সমূহের বিচার বিশ্লেষণ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: কার (১৯৮২) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, আধুনিক গারো তরুণ-তরুণীরা তাদের সঙ্গী বা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠছে। বারলিং (১৯৯৭) একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই বিষয়টি গ্রামে বসবাসরত অনেক তরুণ দম্পত্তির সাথে কথা বলে জানা গেছে। তারা প্রায় সবাই তাদের পছন্দমত সঙ্গীকে নির্বাচন করে অভিভাবকদের জানিয়েছেন। পরবর্তীতে উভয়পক্ষের অভিভাবকরা বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ আগে অভিভাবকরা পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতো, এখন পাত্র-পাত্রী নিজেরাই তাদের পছন্দের সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: বর্তমানে গারোদের মধ্যে অধিকাংশ খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী। বিয়ের ক্ষেত্রে তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের সাংসারেক নিয়মকানুনের চেয়ে খৃষ্টান ধর্মের নিয়মকানুনকে বেশী মানছে। গারোরা বর্তমানে খৃষ্টান বিবাহ বিধি ১৮৭২ (বিধি নং XV, ১৮৭২) অনুসারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। ফলে গারোদের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি এখন তেমন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না।

তৃতীয়ত: বর্তমান এই আধুনিক যুগেএকজন পুরুষের স্ত্রীর বাড়ীতে এসে বসবাস করাকে তার শারীরিক অপহরনের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর বাবার বাড়ীতে বসবাস করতে আসে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রীও তার স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করতে চলে যাচ্ছে।

চতুর্থত: বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যবাহী নিয়ম-নীতির পরিবর্তে খৃষ্টান বিধি সমূহ মানা হচ্ছে।

পঞ্চমত: বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রভাব এবং সংস্পর্শে এসে গারো তরুন-তরুনীদের মধ্যে সঙ্গী হিসাবে বৃহত্তর সমাজের সদস্যদের গ্রহণ করার প্রবনতা বেড়েছে। আপত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে উচ্চশিক্ষিত তরুন সমাজে ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধিনিষেধ খুব বেশী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না।

ষষ্ঠত: বিয়ের আনুষ্ঠানিক স্থান হিসাবে আগে সাধারণত কনের বাড়ীতেই স্থান নির্ধারণ করা হতো। এখন সাধারণত চার্চেই অধিকাংশ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তমত: বিয়ে পরে গারোরা বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ঐতিহ্যগত মাতৃবাস রীতিকে অনুসরন করছে না। বরং আধুনিক গারো দম্পত্তির নয়াবাস রীতিকে বেশী পছন্দ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকক্ষেত্রে পরিস্থিতির চাপে বাধ্যও হচ্ছে। অর্থাৎ মাতৃবাস রীতি এখন নয়াবাস রীতিতে পরিবর্তীত হচ্ছে।

অষ্টমত: কোন কোন ক্ষেত্রে নকনা এবং নকরোম কর্মক্ষেত্রে যোগদানের জন্য অন্যত্র বসবাস করছে। এক্ষেত্রে বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখাশুনা করার জন্য তারা লোক নিয়োগ করছে। অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখাশুনা করার দায়িত্ব নকনা-নোকরোম পালন করলেও প্রত্যক্ষ দায়িত্বটি পালন করছে নকনা কর্তৃক নিযুক্ত গৃহপরিচালক।

নবমত: বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বর্তমান শিক্ষিত গারো তরুণ-তরুণীরা একটু দেরী করে বিয়ে করতে আগ্রহী হচ্ছে। আগে ঐতিহ্যগতভাবে একটু কম বয়সেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিয়ে দিতেন। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে তা সাধারণত ১০ থেকে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৪ থেকে ২৩ বছর ছিল। এখন এই বয়সসীমা কিছুটা বেড়েছে। অনেক তরুণ-তরুণী এখন কিছুটা বেশী বয়সে স্বাধীনভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

৫.২ পরিবার (Family)

পরিবার সমাজের একটি মৌলিক সংগঠন। পরিবার ও বিয়ে দু'টি আলাদা প্রত্যয় হলেও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিয়েএকটি আনুষ্ঠানিকতা যার মাধ্যমে সমাজ নারী-পুরুষের শরীর।

এমবার এর ভাষায়, "A family is a social and economic unit consisting minimally of one or more parents and their children" (Ember & Ember, 1993: 325)।

বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী E.B Taylor পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Family is the key institution in society, consisting of one or more women living with one or more men and their children. A socially approved sex relationship, and various rights and obligations characterize the family. In order of their comparative incidence, the major kinds of marriage-family relationships are monogamy, palygyny, polyandry and group marriage. Common residence and economic co-operation are usually associated with the family. Death or marriage of children may radically change the family. The family is the first institution into which the individual is born. (Taylor, 1990: 200) ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার বলতে বুঝায় এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বিবাহিত এবং রক্ত সম্পর্কসূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজনসহ বসবাস করে (রহমান, ১৯৯০:১০১)।

৫.২.১। গারো সমাজে পরিবার

পরিবার এবং জ্ঞাতি সম্পর্কই হচ্ছে সমগ্র গারো সমাজের সামাজিক সম্পর্কসমূহের মূল নিয়ন্ত্রক। গারো সমাজ মূলত: মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এখানে উত্তরাধিকার মাতৃসূত্রীয়। মা থেকে কন্যা স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। তবে যে কোন গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত মা-বাবা উভয়ই মিলিতভাবে গ্রহন করে থাকে। পারিবারিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পিতাই বেশী পালন করে থাকে। অর্থাৎ গারো পরিবার মাতৃতান্ত্রিক হলেও পিতার অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ় এবং সম্মানজনক।

গারো ভাষায় পরিবারকে "নক" বলা হয়। আক্ষরিক অর্থে "নক" মানে বাড়ী। গারোদের কাছে "নক" মানে একটি জৈবিক পরিবার এবং সেই সাথে একটি গৃহস্থালী। (গোস্বামী এবং মজুমদার, ১৯৭২:১৯)। যাহোক, গারো পরিবার বলতে আমরা বুঝি যারা এক গৃহস্থালীতে বসবাস করে, একসাথে খায়, আয় এর ক্ষেত্রে কমবেশী যাই হোক সবাই অংশগ্রহন করে এবং একটি পারিবারিক সংবিধান মেনে চলে।

সাধারণত স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে গারো পরিবার গঠিত হয়। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করে। গারো সমাজে পরিবার প্রজনন এবং বংশবৃদ্ধির একমাত্র স্বীকৃত একক।

৫.২.২। গারো সমাজে

পরিবার প্রকরন

যে গ্রামটিতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে মূলত সেই গ্রামের অধিবাসীদের পরিবার সমূহকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎরাইল গ্রামে মূলত তিন প্রকারের পরিবার লক্ষ্য করা গেছে। যথা-: অনুপরিবার, যৌথ পরিবার এবং অনুসদৃশ্য পরিবার।

অনুপরিবারের অন্তর্ভূক্ত হলো স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা। আবার যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে অনু পরিবারের অভিভাবকরা তাদের বিবাহিত কন্যা, জামাই, অন্যান্য ছেলে মেয়ে এবং নাতি- নাতনীদের নিয়ে এই পরিবার গঠন করে।

অন্যদিকে অনুসাদৃশ্য পরিবারের অন্তর্ভূক্ত থাকে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান থাকলে সেই সন্তানেরা এবং সেই সাথে স্বামী বা স্ত্রীর কোন বৃদ্ধ পিতামাতা। গারোদের চিরাচরিত মাতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রামের ৫৭টি গৃহস্থালীতে এই তিন ধরনের পরিবার লক্ষ্য করা গেছে। উৎরাইল গ্রামে সব পরিবারেই সন্তান রয়েছে। সন্তানহীন কোন পরিবার ছিল না। আবার শুধুমাত্র একজন সদস্যেরও কোন গৃহস্থালী ছিল না। এই গ্রামের পার্শ্বচিত্র থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অনু পরিবার সমগ্র গারো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নের সারনী-১২তে জনসংখ্যা অনুপাতে উৎরাইল গ্রামের পরিবারের প্রকরণ তুলে ধরা হলো।

সারনী ১২ জনসংখ্যা অনুপাতে উৎরাইল গ্রামের পরিবার প্রকরণ

পরিবারের নাম	গৃহস্থালীর সংখ্যা	শতকরা বিয়ের গৃহস্থালীর সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা
অনু পরিবার	৪৮	৮৪.২%	৪৫৩
যৌথ পরিবার	৭	১২.৩%	৮৭
অনুসাদৃশ্য পরিবার	২	৩.৫%	২০
মোট	৫৭	১০০%	৫৬০

উৎস : মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

সারনী ১২ থেকে উৎরাইল গ্রামের পরিবার প্রকরনে দেখা যাচ্ছে অনুপরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (৪৮.২%) পরিবার হচ্ছে অনুপরিবার, ৭ (১২.৩%) হচ্ছে যৌথ পরিবার, এবং ২ (৩.৫%) হচ্ছে অনুসাদৃশ্য পরিবার। এই গ্রামটির মোট জনসংখ্যা ৫৬০ জন। এর মধ্যে ৪৫৩ জন (৮৪.২%) অনু পরিবারের সদস্য, ৮৭ জন (১২.৩%) যৌথ পরিবারের সদস্য এবং ২০ জন (৩.৫%) হচ্ছে অনুসাদৃশ্য পরিবারের সদস্য।

বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজের পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের সাথে গারো পরিবারের প্রধান পার্থক্য হলো গারো পরিবার মূলত: মাতৃতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থা। যে গ্রামটিতে গবেষণাটি পরিচালনাকরা হয়েছে সেই গ্রামটিতে মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থা বহাল থাকলেও তা আশেপাশের সবগুলো গ্রামের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা পরিবেশিত। ফলে এই গ্রামটির আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক মূল্যবোধেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

ঐতিহ্যগতভাবে গারো সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক হওয়ায় পারিবারিক জীবনে মাতৃবংশের লোকেরা প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এই গ্রামটিতে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিবর্তনের কারন খুঁজতে গিয়ে গৃহস্থালী প্রধানদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কোন ধরনের পরিবার তাদের পছন্দ। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য নিম্নের সারনী-১৩ এ দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী: ১৩ পরিবারের ধরন (গৃহস্থালী প্রধানদের পছন্দ অনুযায়ী)

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা
মাতৃতান্ত্রিক	৩৬	৬৩.১৬%
পিতৃতান্ত্রিক	২১	৩৬.৮৪%
মোট	**৫৭**	**১০০%**

উৎস: মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

সারনী ১৩ থেকে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ গৃহস্থালী প্রধান, ৩৬ (৬৩.১৬%), তাদের সনাতন মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থায় থাকতে আগ্রহী। সেইসাথে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে ২১জন (৩৬.৮৪%) গৃহস্থালী প্রধান তাদের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠনে আগ্রহী। অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যবাহী মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক পদ্ধতির পক্ষে মত দিয়েছে। সেই সাথে এই কথাও সত্য যে বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠনে আগ্রহীদের সংখ্যাও কম নয়।

গারো সমাজে গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে কণ্যা ও পুত্র সন্তানদের পছন্দের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। পরিবারের সদস্য হিসাবে কেউ কণ্যা সন্তানকে আবার কেউবা পুত্র সন্তানকে বেশী পছন্দ করে থাকে। নিম্নে সারনী ১৪তে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্য হিসাবে গারোদের লিঙ্গীয় ভিত্তিক পছন্দের বিষয়টি দেখানো হলো।

সারনী: ১৪ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্য হিসাবে পছন্দ

পরিবারের সদস্য	পছন্দ	
	গ্রহস্থালী প্রধান	শতকরা
কন্যা	৩৮	৬৬.৬৭%
পুত্র	৯	১৫.৭৯%
উভয়	১০	১৭.৫৪%

উৎস : মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

সারনী-১৪তে দেখা যাচ্ছে যে ৩৮জন (৬৬.৬৭%) গৃহস্থালী প্রধান পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের মধ্যে কন্যা সন্তানকে বেশী পছন্দ করছে। আবার ৯ জন (১৫.৭৯%) শুধু মাত্র পুত্রসন্তানকে পছন্দ করছে। অন্যদিকে ১০ জন (১৭.৫৪%) কন্যা ও পুত্র উভয়কেই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্য করতে আগ্রহী। এই তালিকা থেকে পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থালী প্রধান পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্য হিসাবে সনাতনভাবে এখনও কন্যা সন্তানকে বেশী পছন্দ করছে। এরপরও বলা যায় সনাতন পন্থার মধ্যে পরিবর্তন ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে। এর কারন হিসাবে বলা যায় শুধুমাত্র পুত্রকে পছন্দ করছে এমন গৃহস্থালী প্রধানের সংখ্যা একেবারে কম নয়,যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.২.৩। পরিবারের আকার

যে গ্রামে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে সে গ্রামের পরিবার সমূহের আকার সাধারণত ২ থেকে ১০ জনের। নিম্নে সারনী ১৫তে উক্ত গ্রামে পরিবারের আকার হিসাবে পরিবারের সংখ্যার একটি চিত্র দেখানো হলো।

সারনী- ১৫ পরিবারের আকার হিসেবে পরিবারের সংখ্যা

পরিবারের আকার	সংখ্যা	শতকরা
২ জন	৭	১২.৩%
৩-৪ জন	২৩	৪০.৪%
৫-৬ জন	১৮	৩২.৬%
৭-৮ জন	৫	৯.৭%
৯-১০ জন	৩	৫.৩%
মোট	৫৬	১০০%
		১০০.৩%

উৎস: মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

সারনী ১৫তে এ দেখা যাচ্ছে ৫৭টি পরিবারের শতকরা ১২.৩% পরিবারের প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ২ জন করে। শতকরা ৪০.৪%টি পরিবারের প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে ৪ জন। শতকরা ৩২.৬%টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ৬ জন। শতকরা ৯.৭%টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে ৮ জন। শতকরা ৫.৩%টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯-১০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

গারো অসম্পূর্ণ বংশধারার বংশানুক্রমিক তথ্যজ্ঞাপক

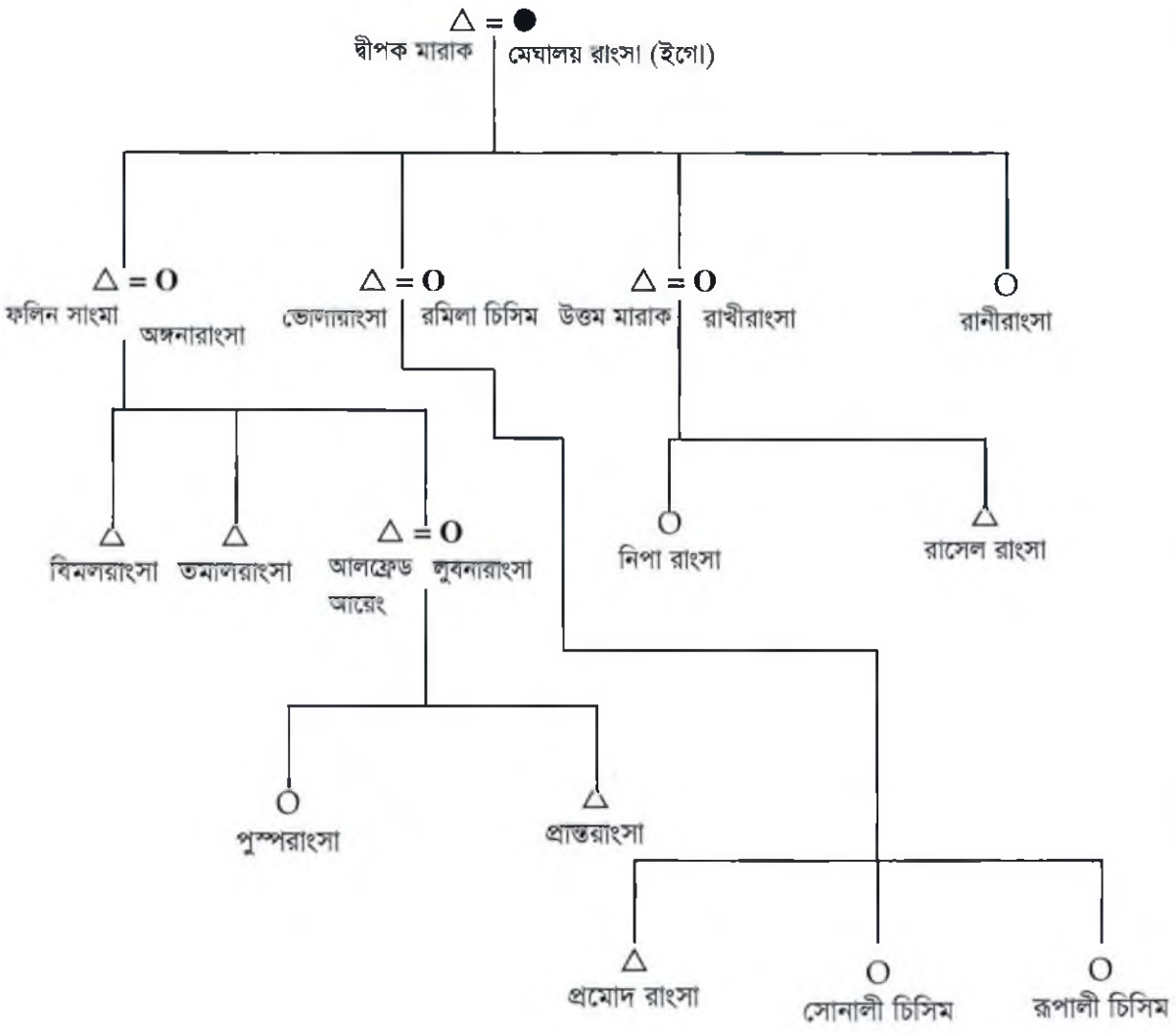

△	=	মৃত ব্যক্তি
△	=	পুরুষ
O	=	মহিলা (অবিবাহিত)
●	=	ইগো
⌐¬	=	ভাই বোনদের সম্পর্ক (সহোদর সম্পর্ক)
=	=	বিবাহিত

Dhaka University Institutional Repository

গারো বংশধারার তথ্য চিত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে ইগো মেঘালয় রাংসা। দীপক মারাক এবং মেঘালয় রাংসা দম্পতির ৩ মেয়ে এবং ১ ছেলে। বড় মেয়ে অঙ্গনারাংনা যিনি বিবাহিতা তার স্বামীর নাম ফলিন সাংমা। অঙ্গনা এবং ফলিন দম্পতির ২ ছেলে ১ মেয়ে। যথাক্রমে বিমল রাংসা, তমাল রাংসা এবং লুবনা রাংসা। লুবনা রাংসা বিবাহিতা তার স্বামীর নাম আলফ্রেড আরেং। এই দম্পতির ২টি সন্তান রয়েছে পুস্প এবং প্রান্ত রাংসা।

মেঘালয় রাংসার (ইগো) মেজ ছেলে ভোলা রাংসা। তার স্ত্রীর নাম রমিলা চিসিম। ভোলা-রমিলা দম্পতির ৩ সন্তান। তাদের ১ম সন্তান প্রমোদ পিতার পদবী গ্রহন করেছে সনাতন প্রথায় মায়ের পদবী অনুসারে তার নাম হওয়া উচিত ছিল প্রমোদ চিসিম। পিতার পদবী গ্রহণ করায় তার নাম হয়েছে প্রমোদ রাংসা। এই দম্পতির ২য় এবং ৩য় সন্তানের নাম যথাক্রমে সোনালী ও রূপালী চিসিম।

মেঘালয় ও দীপক দম্পতির তৃতীয় সন্তান রাখী রাংসা। সে বিবাহিত তার স্বামীর নাম উত্তম মারাক। তাদের ২টি সন্তান আছে নিপা ও রাসেল রাংসা। মেঘালয় ও দীপক দম্পতির চতুর্থ সন্তানের নাম রানী রাংসা সে অবিবাহিত। সে এই পরিবারের নোকনা তার স্বামী হবে নোকরোম।

৫.২.৪ গারো সমাজে পরিবারে পরিবর্তনের ধারা

বর্তমানে গারো সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারে কিছু পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। এগুলো সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো।

প্রথমত : গারো সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকলেও অনুপরিবারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। একটি ধীর এবং পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় যৌথ পরিবার ভেঙ্গে অনুপরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে। অনুপরিবারের সাথে অনুসাদৃশ্য পরিবারও বর্তমান। সমস্ত সমাজ কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছে অনুপরিবার।

দ্বিতীয়ত: গারো সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃস্থানীয় হলেও বৃহত্তর সমাজের প্রভাবে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা ক্রমশ: প্রভাব বিস্তার করছে।

তৃতীয়ত্ব: অধিকাংশ গৃহস্থালী প্রধান পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্য হিসাবে কন্যাসন্তানকে বেশী পছন্দ করলেও শুধুমাত্র পুত্র সন্তানকে পছন্দ করে এমন গৃহস্থালীর সংখ্যাও কম না। এর

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পরিবারের অন্তর্ভূক্ত সদস্য হিসাবে কন্যাসন্তানের পাশাপাশি পুত্রসন্তানও ক্রমশ স্থান করে নিচ্ছে।

চতুর্থত: গারো সমাজের অতীত অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তারা কখনও জন্মনিয়ন্ত্রণ পছন্দ করত না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি পরিবার পরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থায় আগ্রহী। অনেক সক্ষম দম্পত্তির সন্তান সংখ্যা ১ জন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২ জন। কখনও কখনও ৩ জন সন্তানের পরিবারও দেখা যায়। এ থেকে সহজে প্রতীয়মান যে গারো সমাজে পরিকল্পিত পরিবার পুরোপুরি স্থান করে নিয়েছে।

৫. ৩ গোষ্ঠী সংগঠন (Grorp)

গোষ্ঠী বলতে সাধারনভাবে আমরা বুঝি পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এবং আবেগ ও সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি।

নৃবিজ্ঞানী E.B Taylor গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "A group of persons as seen from the viewfoint of a member of the group, in contrast with other groups and persons who are not members of the group" (Taylor, 1991: 282) ।

সমাজবিজ্ঞানী Desmond Morris গোষ্ঠীর বর্ণণা করেছেন এভাবে, "Socially the hunting ape to increase his urge to communicate and to co-operate with his fellows ..... with the new weapons to hand, he had to develop powerful signals that would inhileit attacks within the social group.On the other hand he had to develop stronger aggressive responses to member rival group" (Morris, 1967:23) ।

৫.৩.১ গারো সমাজে গোষ্ঠী সংগঠন

সমগ্র গারো সমাজ কয়েকটি পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্লেফেয়ার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানের ভিত্তিতে গারোদের ১২টি ভাগে বিভক্ত করেন। সেগুলো হচ্ছে একাওই(আওই), চিসাক, দুয়াল, মাটি, মেথারেং, কচি, আতিগারা, আবেং, চিবাক, রূপা, গাংচিং, এবং আক্তং (প্লেফেয়ার, ১৯০৯:৫৯)। ১৯৬৭ সালে নাকনে গারোদের সামাজিকও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ৭টি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, যেমন-আওইচিসেক ও কাচু, আবেংও আতিগারা, মাচি এবং মেটারেং, গারো অথবা গানচিং, আতং, চিবাক ও রুগা, দুয়াল (নাকনে, ১৯৬৭:২০)।

Dhaka University Institutional Repository

আওই গোষ্ঠীর অধিবাসীরা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী গারো পাহাড়ের উত্তরদিকের ঢালু এবং সমতল অঞ্চলে বসবাস করে। এরা আকাও নামে পরিচিত যার আক্ষরিক অর্থ "সমতল এলাকার বাসিন্দা" এবং আওই অর্থ "মই দিয়ে চাষ"। তাই যে সব অধিবাসীরা জমি চাষ করে তাদেরকে আওই বলা হয়। "চিসাক" গোষ্ঠীর অধিবাসীরা গারো পাহাড়ের উত্তর পূর্বাংশে বসবাস করে। "চি" শব্দের অর্থ পানি, "সেক" শব্দের অর্থ "অধিকতর"। সুতরাং শাব্দিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় পানির উৎস অঞ্চলের বাসিন্দা। গাংচিং গোষ্ঠীর অধিবাসীরা নিতাই নদী এবং সোমেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। এই গোষ্ঠীর অধিবাসীরা কুটিরশিল্প এবং ভাস্কর্য নির্মাণ করার জন্য বিখ্যাত। এদের রয়েছে নিজস্ব গৃহনির্মাণ শৈলী। আতং গোষ্ঠীর অধিবাসীরা সোমেশ্বরী নদীর উপত্যকায় গারো পাহাড় থেকে উত্তরে সিজু পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা গারোদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গোষ্ঠী। চিবাক এবং রুগা অপেক্ষাকৃত ছোট গোষ্ঠী। চিবাক এবং রুগার অধিবাসীরা বোগাই নদল উপত্যকায় বিস্তৃত। বর্তমানে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ সীমান্ত অঞ্চলের গারো পাহাড়ের পাদদেশে এদের অবস্থান। দুয়াল এর অধিবাসীরা অধিকাংশই বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করে। প্লেফেয়ারের প্রকরণ অনুযায়ী মাত্র ৫টি গোষ্ঠী বাংলাদেশে দেখা যায়। সেগুলো হচ্ছে আবেং, চিসাক, দুয়াল, গাংচিং এবং আতং। নাকনে গারো জনসংখ্যার যে মানচিত্র দিয়েছেন তাতে দেখা যায় আবেং গোষ্ঠীর আধিপত্যই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী। বর্তমান গবেষণাটিতে উত্তরদাতাদের কাছে তাদের গোষ্ঠীগত পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ উত্তরদাতা এর প্রশ্নের উত্তরে কোন কিছু বলতে ব্যর্থ হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব অন্ত:গোষ্ঠী পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দীর্ঘদীন থেকে গারো জনগোষ্ঠী তাদের অন্ত:গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সেই সাথে সহজে আত্মীয়করণ করা যায় এমন একটি সাংস্কৃতিক বৃত্তকে ধারণ করে চলেছে। সময়ের সাথে সাথে আর্থ সামাজিক পরিবর্তন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সমস্ত গোষ্ঠী অথবা উপগোষ্ঠী সমূহ বিলুপ্ত হয়ে শুধুমাত্র একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিতে রূপান্তরিত হবে।

৫.৪ গোত্র সংগঠন:

ঐতিহ্যগতভাবে সমগ্র গারো নৃগোষ্ঠী অর্ন্ত:গোষ্ঠীয়। বিয়ে এবং পরিবার সংগঠনের ক্ষেত্রে তারা অর্ন্ত:গোষ্ঠীয়, কিন্তু বহি:গোষ্ঠী রীতি মেনে চলে। সমগ্র গারো আদিবাসীগোষ্ঠী কয়েকটি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, এই গোত্রগুলোকে চাটচী বলা হয়। প্রতিটি গারো ব্যক্তি-জীবন এবং সামাজিক কর্মকান্ডে চাটচী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গারো সমাজ অত্যন্ত কঠিনভাবে বহি:গোত্রীয় বিবাহ রীতি মেনে চলে। এ পর্যন্ত যে সব গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো সাংমা, মারাক, মমিন, সিরা এবং আরেং। বাংলাদেশে প্রধানত সাংমা এবং মারাক গোত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। গবেষণা পরিচালনা করার সময় উৎরাইল গ্রাম সহ দূর্গাপুর থানায়

Dhaka University Institutional Repository

(উপজেলা) বেশ কিছু সংখ্যক আরেং গোত্রের অধিবাসী দেখা গিয়েছে। নিচের সারনী-১৬তে গারো সমাজের গোত্র এবং উপগোত্র সমূহের একটি তালিকা দেয়া হলো।

সারণী-১৬: গারো সমাজের গোত্র এবং উপগোত্র সমূহ

গোত্র অথবা চাটচী	উপগোত্র অথবা মাচং
সাংমা	আজিত, আওই, বেহরান, বোলডাক, বোলডং, বোলওয়ারি, চেহরান, চিসিক, দাওয়া, ডেনডেজিল, জিনেং, গুড়ি, ককসি, মান্দা, মানকিন, ম্রি, ম্যাংস্যাং, নেংমিনজা, রোকো, রোংমনথু, সানি, সিংস্যাং, রোনরোক, গ্রি, সামপাল, টিজিটি, উদরাং
মারাক	চামবুগং, চাদা, চিসিম, দেজেল,দোপো, দাপাল, দোকোনাছি, দোকাপ্রি,দিউ, দারু, গারে, কামা, কোকনাল, কোং কাই, মরং, নাগাক, কোকরাক, পানটো, পাথাং, রাংসা, রাকসাম, রেমা, রোচিল, সিনতাং
মমিন	গাবিল, গানদিম, জাগিচিত, নারগ্রি, মেগান, ব্রারেন দা, সেকা, ওয়াগি, ওয়াতরে,
সিরা	দালবোত
আরেং	দোচিক নংবোক

উৎস : মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

এই গ্রামটিতে গবেষণা করার সময় ৩ ধরনের গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তা হলো সাংমা, মারাক এবং আরেং। অধিকাংশ গৃহস্থালী প্রধানত দু'টি গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তা হলো সাংমা ও মারাক। এ ক্ষেত্রে নিচের সারনী-১৭তে গোত্রের অন্তর্ভূক্ত গৃহস্থালী প্রধানদের তালিকা তুলে ধরা হলো।

সারনী-১৭ গোত্রের অর্ন্তভূক্ত গৃহস্থালী প্রধানদের তালিকা

গোত্র	সংখ্যা	শতকরা
সাংমা	২৫	৪৪.৩%
মারাক	২৯	৫০.৯%
আরেং	৩	৫.৩%
মোট	৫৭	১০০%

উৎস : মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

যে গ্রামটিতে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে সে গ্রামের গোত্রগুলো নয়টি বৈশিষ্ট্যের এবং একে অপরের সহকারী। গোত্র সমূহের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

গোষ্ঠী বা চার্টচী সংগঠনের পরবর্তী উপগোত্র সংগঠন হচ্ছে "মাচং"। "মাচং" এর শাব্দিক অর্থ হলো একই মায়ের বংশোদ্ভূত একদল জনগোষ্ঠী। প্রতিটি মাচং বহি:বিবাহ রীতি অত্যন্ত কঠিনভাবে মেনে চলে। প্লেফেয়ার মনে করেন একটি পরিবার যা সময়ের সাথে সাথে দীর্ঘ হয়ে মাচং তৈরী করে। কয়েকটি মাচং মিলে আবার একটি গোত্র বা চার্টচী হয়ে থাকে (প্লেফেয়ার, ১৯০৯:৬০)।

ঐতিহ্যগতভাবে মাচং সংগঠনটি এলাকা ভিত্তিক হয়ে থাকে। মাচং এর সদস্যরা একজন প্রধান বা নেতার অধীনে জমিতে চাষবাস করে থাকে। জমি তাদের মাচং এর সম্পত্তি, এটি গোষ্ঠী মালিকানার অধীন। সাধারণত নোকনা গ্রাম প্রধানের দায়িত্বে থাকে এবং তার স্বামী সব ধরনের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করে। সামাজিক বিধিবিধান কার্যকরী করতে এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাচং এর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাচং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এখানে উল্লেখ করা হল। ঐতিহ্য অনুসারে গারো সমাজে কনিষ্ঠা কন্যা উত্তরাধিকার মনোনীত হয়। কন্যা সন্তান না থাকলে স্বামী-স্ত্রী তাদের পছন্দ অনুযায়ী উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। যখন স্বামী-স্ত্রী উত্তরাধিকার মনোনীত করতে ব্যর্থ হয় তখন মাচং উত্তরাধিকার নির্বাচন করে থাকে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সাথে সাথে মাচং এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নোকনার জন্য স্বামী নির্বাচন করা। ঐতিহ্যবাহী প্রথা অনুযায়ী নোকনার স্বামী তার বাবার মাচং থেকে মনোনীত করা হয়। এই প্রথা এগেইট কন্যা সন্তান এর জন্য প্রযোজ্য নয়।

গারো সমাজে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হলো শ্বশুরের মৃত্যুর পর নোকরোমের দায়িত্ব হলো শ্বাশুড়ীকে পূর্ণবিবাহ করা। এই পরবর্তী বিয়েটি নোকরোম এর স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীর জন্য পরিবারে নির্বাহী দায়িত্ব পূরণের এর অপরিহার্য। মাচং এই পূর্ণবিবাহের দায়িত্বটি পালন করে থাকে এবং আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উত্তরাধিকারী মনোনীত কন্যাকে (নোকনা) অবশ্যই তার ঐতিহ্য এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে হয়। সে যদি ধর্মান্তরীত হয় তবে মাচং তাকে বহিস্কার করে এবং অন্য কাউকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে। একইভাবে মায়ের সাথে ঝগড়া করলে অথবা একই গোত্রের কাউকে বিয়ে করলে মাচং তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে।

পরিবার হচ্ছে মাচং এর মূল ভিত্তি। পারিবারিক সম্পত্তি এবং বিয়ে পুরোপুরি মাচং এর নিয়ন্ত্রণাধীন। পারিবারিক সম্পত্তি কখোনই এক মাচং থেকে অন্য মাচং এ হস্তান্তরযোগ্য নয়। সে জন্য মাচং কখনোই বহু বিবাহকে স্বীকৃতি দেয় না। স্ত্রী মারা গেলে বা বিবাহবিচ্ছেদ হলে

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীকে অবশ্যই পূর্ণবিবাহ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্ত্রী মাচং থেকে কনে নির্বাচন করতে হয়। একইভাবে বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাকে পূর্নবিবাহ করতে হলে পূর্ববর্তী স্বামীর মাচং থেকে বর নির্বাচন করতে হয়।

ব্যাভিচার গারো সমাজে মারাত্মক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। যদি কোন স্ত্রী/নোকনা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে তখন সে তার আত্মীয়স্বজনকে সে অভিযোগের কথা বলে। যদি অপরাধ প্রমানীত হয় তখন মাচং স্বামীকে শাস্তি প্রদান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদও ঘটে থাকে, এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে মাচং। কারও স্ত্রী ব্যাভিচার করলে তাকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া হয়। মূল ভূমিকায় থাকে মাচং।

কোন দম্পত্তি নি:সন্তান হলে উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য তাকে সন্তান দত্তক নিতে হয়। সাধারণত স্ত্রী তার বোনের মেয়েকে উত্তরাধিকার হিসাবে দত্তক নিয়ে থাকে। যদি বোনের কোন কন্যা সন্তান না থাকে তাহলে মাচং থেকে কোন কন্যাকে দত্তক নিতে হয়। যদি মাচং এ কোন উপযুক্ত কন্যা না থাকে তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তি মাচং এর সদস্যদের মধ্যে বন্টিত হয়।

কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তাকে একটি তলোয়ার, একটি ঢাল ও কাপড় সাথে নিয়ে মৃত স্বামীর মায়ের কাছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন শোক পালন করতে হয়। যদি সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, তবে প্রথম স্বামীর মাচং থেকে দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে মনোনীত ব্যক্তিকে তার মায়ের সামনে ঐ একই জিনিস সহযোগে প্রতি প্রার্থনা করতে হয় এবং টাকা দিতে হয়। সে দিতে ব্যর্থ হলে তার মাহারী অর্থাৎ নকনা এই টাকা দেয়। প্লেফেয়ার, ১৯০৯:৭০, মুখার্জী, ১৯৫৫: Vol.৯ ও ১৯৭৪:২৪-২৫, বারলিং, ১৯৬৩:১৯৯-২০০)। নিচের সারনী-১৮তে বিভিন্ন মাচং-এ গৃহস্থালী বন্টনের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১৮ বিভিন্ন মাচং এ গৃহস্থালী বন্টনের তালিকা

মাচং এর নাম	সংখ্যা	শতকরা
আজিতোত	৩	৫.৩%
সিংস্যাং	১	১.৭%
চেহরান	৩	৫.৩%
ম্যাংস্যাং	৭	১২.৩%
নেং সিনজা	২	৩.৫%
রোক্কো	১	১.৭%
চেমজেং	১	১.৭%
উদরাং	১	১.৭%
জেংচাম	৩	৫.৩%
চামবুগং	৫	৮.৮%
চিসিত	৩	৫.৩%
দিউ	২	৩.৫%
দোপো	৩	৫.৩%
মরুং	৪	৭.০%
রাংসা	১২	২১.০%
রেমা	২	৩.৫%
রোচিল	৩	৫.৩%
নংবোক	১	১.৭%
মোট	**৫৭**	**১০০%**

উৎস: মাঠ পর্যায় জরীপ ২০০৫

সারনী-১৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উৎরাইল গ্রামে ৫৭টি গৃহস্থালী প্রধানত ৩টি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং হলো সাংমা,মারাক এবং আরেং। এই গৃহস্থালীগুলো আবার ১৮টি গোত্রের মধ্যে বন্টিত রয়েছে। গোষ্ঠীর মধ্যে গোত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে তালিকাতে দেখা যাচ্ছে ৯টি মাচং যথা আজিতোত, সিংস্যাং, চেহরান,ম্যাংস্যাং, নেংসিনজা, রোক্কো,চেমংে, উদরাং,এবং জেংচাম সাংমা গোষ্ঠীর অর্ন্তগত। মারাক গোষ্ঠীর অধীনে রয়েছে ৮টি মাচং যথা চামবুগং,চিসিম,দিউ,দোপো,মরুং, রাংসা, রেমা, এবং রোচিল। আরেং গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত ১টি মাত্র মাচং রয়েছে এবং তা হল নংবোক।

তালিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে এই গ্রামে রাংসা মাচং এর আধিপত্য সবচেয়ে বেশী (২১.০%)। এরপর ম্যাংস্যান গোত্রের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে ১২.৩% এছাড়া অন্যান্য মাচং সমূহ ১.৭% থেকে ৮.৮% এর মধ্যে অবস্থান করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ উপগোত্র সংগঠন

গারোদের উপগোত্র সংগঠন হচ্ছে মাহারী। গোস্বামী এবং মজুমদার মনে করেন মাহারী হচ্ছে গারোদের সামাজিক সংগঠনের ক্ষুদ্রতম একক যার সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট গোত্রের নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি যারা একই গ্রামে বসবাস করে গোস্বামী ও মজুমদার (১৯৭২:৩৪)। মাহারীতে অন্তর্ভূক্ত হয় খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ যারা একই গোত্রের (খালেক, ১৯৮৩:৯০)। মাহারীকে বর্ধিত পরিবারও বলা যায়। মাহারী সংগঠন এবং কার্যক্রমের দিক থেকে মাচং এর অনুরূপ।

৫.৫.১ উপগোত্রীয় সংগঠনে পরিবর্তনের ধারা

প্রথমত: গারো আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রধান পরিচয় আজ বিলুপ্তির পথে। গারো আদিবাসীয় পরিচয়টি শুধু বর্তমান।

দ্বিতীয়ত: সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারনে মাচং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখলেও ধর্মান্তরীত হওয়ার ফলে এর গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয়ত: মাহারীর ভূমিকা একটি বর্ধিত পরিবারের মত হলেও প্রতিটি গৃহস্থালী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। বর্তমানে মাহারীর গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

চতুর্থত: সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী গোত্রভিত্তিক মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পদের ধারণা স্থান করে নিচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার নীতিতে মাচং এর ক্ষমতা এবং গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

পঞ্চমত: ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজের উত্তরাধিকারী রীতিতে যেভাবে কনিষ্ঠা কন্যা (নোকনা) মাতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হতো বর্তমানে সে উত্তরাধিকাররীতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই গ্রামে বেশ কিছু পরিবারে দেখা গেছে অন্যান্য কন্যারা (এগেইট) সম্পত্তির মালিকানা পাচ্ছে।

ষষ্ঠত: সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে গারো সমাজের প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা ব্যাহত হচ্ছে এবং সম্পত্তিতে পুত্র সন্তানেরা মালিকানা পাচ্ছে।

সপ্তমত: পুণবিবাহের সময় ঐতিহ্যবাহী নিয়মগুলো অনেকেক্ষেত্রেই পালন করা সম্ভব হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬। কেসষ্টাডি

গারো সমাজ জীবনের সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ে কিছু কেসষ্টাডির অন্তর্ভূক্ত করা যা এই গবেষণার বিষয়কে আরও গভীরভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

৫.৬.১। কেসষ্টাডি-১

উৎরাইল গ্রামের মেয়ে কল্পনা আরেং (৩৫)। তার বাবা পুনীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা গৃহিনী। ছোট বেলা থেকেই কল্পনা লেখাপড়ায় ভাল। ১৯৮৮ সনে স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বিশ্বদ্যিালয় কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতনকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। কল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়একই বিভাগের ছাত্র নবীন সাংমরে সাথে পরিচয় ঘটে। নবীনের বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাটে। বিশ্বদিল্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তারা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং উভয় পরিবারেব অভিভাবকদের জানান। উভয় পরিবারের অভিভাবকরা মিলিত হয়ে বিয়ের দিন-তারিখ ধার্য করে এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৯৪ সালের ২২শে মে হালুয়াঘাট প্রষ্টেটান চার্চে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। পরে তারা উভয়ে একটি বেসরকারী সাহায্য সংস্থায় চাকুরীতে যোগদান করেন। কল্পনা পরিবারের এগেইট সন্তান হওয়ায় দুই বছর তারা কল্পনার পরিবারের সাথে এক সাথে ছিলেন।

কল্পনা গারোদের অর্জিত ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। সে ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষা লিখে থাকে। সে আমাকে আরও জানায় বাংলাদেশে বসবাসরত গারোদের ভাষা এবং ভারতে বসবাসরত গারোদের ভাষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কল্পনার বেশকিছু আত্নীয়-স্বজন ভারতে বসবাস করে তাদের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। কল্পনা নিজেও প্রায়ই তাদের ভাষা বুঝতে পারেন না বলে জানালেন।

কল্পনা নিজে গারো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি, বিশ্বায়ন, নগরায়ন এবং শিল্পয়ায়ন গারো সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে বলে তিনি মনে করেন। কল্পনা খৃষ্ট ধর্মের প্রসারকে গারো সমাজের গঠিত পরিবর্তনের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। এর অনুষঙ্গ হিসাবে শিক্ষার প্রসার,দ্রুত বর্ধমান নগরায়ন,বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। গারোদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও বেশী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিত বলেও তিনি মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২০০১ সালে তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। উৎরাইল গ্রামে তারা কিছু জমি কিনে একটি বাড়ী নির্মাণ করেছেন। বাড়ী নির্মাণের জন্য "গৃহনির্মাণ" ঋণ গ্রহন করেছেন একটি বেসরকারী সংস্থা থেকে যা এখন প্রতিমাসে নির্দিষ্ট অংকের কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করছেন।

৫.৬.২। কেসষ্টাডি-২

উৎরাইল গ্রামের মেয়ে শিল্পী খীসা (২৪)। তার মা-বাবা দুজনেই কৃষি কাজ করেন। স্থানীয় স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর শিল্পী দূর্গাপুর ডিগ্রী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এ সময় একই কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত পার্শ্ববর্তী গ্রামের আজিজের সাথে পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তারা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিয়েতে শিল্পী এবং আজিজের পরিবারের কেউই রাজি ছিলেননা। শিল্পী পরিবার এবং সমাজের অমতে আজিজকে বিয়ে করে। বিয়ের পর সে আজিজের বাড়ীতে থাকে। আজিজের পরিবারও তাকে মেনে নেয়। এভাবে সে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আজিজ ও তার পরিবার শিল্পীকে বাবার বাড়ী থেকে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা আনার জন্য চাপ দেয় এবং দৈহিক ও মানবিক নির্যাতন করে বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। শিল্পীর বাবা-মায়ের আর্থিক অবস্থা ভাল না। ফসল যা পায় তা দিয়ে কোন রকমে হিসাব করে সংসার চলে কিন্তু কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। শিল্পীর দরিদ্র বাবা তাকে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে আজিজের বাসায় পাঠায়। এরপর আজিজ কিছুদিন শান্ত থাকে। এরপর ব্যবসা করবে বলে শিল্পীকে তারা বাবা-মার কাছ থেকে আরও ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা আনতে বলে। শিল্পী এতে অস্বীকার করলে তাকে আজিজ প্রচন্ডভাবে দৈহিক নির্যাতনকরে বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। অন্তঃসত্ত্বা শিল্পী তার পরিবার এবং সমাজে বেশ নিগৃহীত হয়। বাবা-মার বাড়ীতে সে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। এরপর থেকে সে তার সন্তানসহ তার মা-বাবার সাথে বসবাস করতে থাকে। সেতার স্বামীর সাথে যোগাযোগ করলে আজিজ অস্বীকার করে শিল্পীকে ফিরিয়ে নিতে। শিল্পী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। অনুভব করে বর্তমানে সে স্থানীয় একটি সমবায় সমিতিকে হস্ত শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

শিল্পী গারোদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেণ । সেই সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনকে গ্রহন করতে আগ্রহী। যেমন তার বিশেষ ইচ্ছা আছে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে মেয়ে পোশাকের ছোটখাট একটা দোকান খোলার। শিল্পী মনে করে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং শিক্ষার সুযোগ গারো সমাজকে বৃহত্তর সমাজের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এছাড়া এইসব কারনগুলো গারো সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব রাখছে। তার মতে গারোদের ভাগ্যন্নোয়নে আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬.৩। কেসষ্টাডি-৩

আখি রাংসা (২৯) এই গ্রামেরই মেয়ে। তিনি সাংসারেক গারো। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী বিমান সংস্থার স্টুয়ার্ডেস হিসাবে কর্মরত। দূর্গাপুর ডিগ্রী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি জি, এম, জি এয়ারলাইনসে টুয়াড্রেস হিসাবে যোগ দেন। ২০০০ সালে এই গ্রামেরই ছেলে সৃজন আরেং এর সাথে তার বিয়ের হয়। সৃজন এবং আখি উভয়েই পূর্ব পরিচিত ছিল। বর্তমানে সৃজন একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী করে। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বর্তমানে তারা ঢাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করছে। বিয়ের পর থেকেই তারা নয়াবাস রীতি অনুসরন করছে। আখি পরিবারের নকনা সন্তান। আখি এবং তার স্বামী নোকনা এবং নকরোম হওয়ায় আখির অভিভাবকদের বৃদ্ধ কালে দেখাশোনার দায়িত্ব তার। তিনি নিজে চাকরীর জন্য গ্রামে থাকতে পারেন না। সে জন্য বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখাশোনার জন্য লোক নিয়োগ করেছেন। প্রতি মাসে যে কোন একটি সাপ্তাহিক ছুটিতে তিনি গ্রামে যান। ২০০২ সালে তার বাবা মারা যায়। এরপর আখি চেষ্টা করেছেন তার মাকে ঢাকায় তার বাসায় এনে রাখার জন্য কিন্তু তার মা ঢাকায় বেশীদিন থাকতে পারেন না। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বর্তমানে আখির মা গ্রামে থাকেন। আখির আট বছরের কন্যা সন্তানটিও গ্রামে থাকে তার নানার সাথে। সে স্থানীয় মিশনারী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

আখি গারোদের ইতিহাস সম্পর্কে বলছেন যে তিনি জানেন গারোরা এক সময় তীব্বত অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তীতে আসামসহ এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে এবং স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন করে। তিনি আরও জানেন যে এখানে একসময় গারো রাজ্যছিল। মুক্তিযুদ্ধে অনেক গারো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেছে। পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ১৯৭৫-৭৭ সালের দিকে, গারোদের ভুল পথে পরিচালনার চেষ্টা করে। বর্তমানে নগরায়ন এবং শিক্ষাবিস্তারের ফলে গারোরা বৃহত্তর সমাজের কাছাকাছি এসেছে। এতে উভয় পক্ষেরই অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে। সরকারীক এবং বেসরকারী সংস্থা উভয়ের আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা উচিত।

৫.৬.৪। কেসষ্টাডি-৪

উৎরাইল গ্রামের অধিবাসী হিমালয় রাংসা (৭০)। এই বয়সেও যথেষ্ট পরিশ্রমী তিনি। তার ৩ বিঘা কৃষি জমি আছে। এখনও তিনি নিজেই জমি দেখাশুনা করেন। ২০০২ সালে তার স্বামী মারা যান। তার পাঁচ ছেলে-মেয়ে এরা সবাই শিক্ষিত। তার এক মেয়ে এক ছেলে ঢাকায় তাদের কর্মক্ষেত্রে বসবাস করে। তিন মেয়ের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। গারো বাজারে তার একটি কাপড় এবং পোশাকের দোকন রয়েছে। আরেকজন স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। সর্বকনিষ্ঠ জন একটি বেসরকারী বিমান সংস্থায় কর্মরত। ছেলেদের একজন ব্যবসায়ী, তার একটি ঔষধ এবং ষ্টেশনারী দোকান আছে। আরেকজন ঢাকায় একটি ব্যাংকে চাকরীরত।

Dhaka University Institutional Repository

হিমালয় একজন সাংসারেক গারো। তিনি এখনও সাংসারেক ধর্মের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেন। তার স্বামীও সাংসারেক ছিলেন। ছেলেমেয়েরা সবাই প্রটেস্টান খৃষ্টান।

হিমালয় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যবাহী নীতিকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে গেছেন। যেমন তিনি তার বসত বাড়ীটি তার প্রতিটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা সবাই একই উঠানে আলাদা ঘর করে বসবাস করছেন। হিমালয়ের ঘরটি তার কনিষ্ঠ কন্যা পেয়েছে। এই কন্যা ঢাকায় বসবাস করে। কিন্তু প্রতিমাসে মাকে দেখতে আসে। হিমালয়ের সুবিধার জন্য সে একজন বেতনভূক্ত লোক নিয়োগ করেছে। হিমালয়ের পৌত্রী (নকমার সন্তান) তার সাথে থাকে। সন্তানরা সবাই যত্ন করে। তিনি সন্তানদের ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট। বর্তমানে তার যে কৃষি জমি রয়েছে তা তিনি নিজেই ভোগ করছেন এবং এর আয় তিনি নিজে খরচ করেন। মাঝে মাঝে সন্তানদের প্রয়োজনে তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেন। গারো প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তিনি প্রচলিত আইনের বিরোধী নন কিন্তু একজন মা হিসাবে কিভাবে তিনি অন্য সন্তানকে বঞ্চিত করবেন তা সে ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক।

হিমালয় জানেন এক সময় এ অঞ্চলে একটি স্বাধীন গারো রাজ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে গারোদের অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। তিনি নিজে এক সময় তার পূর্ব-পুরুষদের সাথে জুম চাষে অংশগ্রহণ করেছেন। জুমচাষ নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং বনাঞ্চলসমূহ সরকারের সংরক্ষিত সম্পত্তি ঘোষণা করায় অনেক গারো পরিবার সর্বশান্ত হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের ফলে অনেক গারো ভারতে রয়ে গেছেন। হিমালয়ের আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই ভারতে আছেন। এখনও তাদের সাথে যোগাযোগ আছে। প্রায়ই সীমান্ত পার হয়ে তারা এদেশে আসেন। হিমালয়ও মাঝে মাঝে যান। বিশেষ করে বড়দিনের প্রাক্কালে তারা ভারতে বিভিন্ন পণ্যের বাজার করতে যায়। হিমালয় তখন মাঝে মাঝে তার মেয়ের সাথে যান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তার স্বামী স্বক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অনেক গারো যুদ্ধে অংশগ্রহন করে। ১৯৭৫-৭৭ সালের দিকেও এ অঞ্চলে রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। পরে সরকার তা দমন করে। হিমালয় মনে করেন খৃষ্ট ধর্মের প্রসার, শিক্ষাবিস্তার, এবং নগরায়ন গারো জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বৃহত্তর সমাজের সাথে গারোদের যোগাযোগ বাড়ছে। এতে অনেক ভুল ধারনার অবসান হচ্ছে আবার অনেকে প্রতারিতও হচ্ছে।

তিনি আরও মনে করেন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ, বিশেষ করে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬.৫। কেসষ্টাডি-৫

নয়ন সাংমা (৩৩) এই গ্রামের সন্তান। বর্তমানে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটি সরকারী অফিসে কর্মরত। তার বাবার নাম নলিন সাংমা এবং মার নাম সুনিতি রাংসা। গারো ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক প্রথা অনুসারে তার নাম হওয়া উচিৎ ছিল "নয়ন রাংসা"। নয়ন পিতার পদবী "সাংমা" গ্রহন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থার জন্য প্রায়ই সহপাঠী এবং বন্ধুরা তাকে বিদ্রুপ করত। সে সময় নয়ন এফিডেফিট করে নাম পরিবর্তন করে পিতার পদবী গ্রহন করেন। বর্তমানে নয়ন এক সন্তানের জনক। তার সন্তানের নামের সাথেও তার পদবী যোগ করা হয়েছে।

নয়ন সাংমা আরও বলেন এই অঞ্চলে এক সময় স্বাধীন গারো রাজ্য ছিল। পরে হিন্দু মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা নিহত হন এবং গারো রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৪৮ সালের দেশ বিভাগের পর গারোদের বৃহত্তর অংশ ভারতীয় শাসনের অধীনে চলে যায়। ভারতীয় গারোরা মূলতঃ পাহাড়ী গারো। বাংলাদেশের গারোরা প্রধানত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সত্তর এর দশকে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়, পরবর্তীতে সরকার তা দমন করে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, এবং নগরায়ন গারোদের ঐতিহ্যবাহী সমাজকে বদলে দিচ্ছে। গারোরা বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে আসলেও এখনও বৃহত্তর সমাজে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্থ হতে পারে নি। নয়ন মনে করেন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ করা উচিৎ। এবং সেইসাথে আত্মকর্মসংস্থানকেও উৎসাহিত করা উচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-ছয়

অর্থনৈতিক সংগঠন

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানবশ্রম দিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার মধ্যে দিয়ে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং একে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিটি সমাজের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মপ্রীতি এবং উৎপাদন কৌশল রয়েছে সামগ্রিকভাবে যাকে আমরা অর্থনৈতিক সংগঠন বলতে পারি। অর্থনৈতিক সংগঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন প্রক্রিয়া, সম্পত্তির ধারণা, মালিকানা এবং সম্পত্তিতে মালিকানার ধরণ।

প্রতিটি সমাজের মতো গারো সমাজের একটি প্রধান এবং নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংগঠন রয়েছে। গারো সমাজের প্রধান অর্থনীতি কৃষি এবং উৎপাদন সংগঠন গোষ্ঠীগত। ঐতিহ্যগতভাবে গারোরা জুম চাষে অভ্যস্ত। কিন্তু সরকারীভাবে জুম চাষ নিষিদ্ধকরণ, চাষযোগ্য জমির স্বল্পতা এবং অন্যান্য পরিবর্তনের ফলে তারা বর্তমানে সেচ কৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

৬.১। পেশাগত অবস্থা:

ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে তারা সম্মিলিতভাবে পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। সম্মিলিতভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি গৃহস্থালীর সক্ষম ব্যক্তিদের একই পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ গারো সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একই মাহারী উপগোত্রের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ, শিকার, মৎস্য শিকার, বাড়ী নির্মাণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। বৃটিশ আমলে প্রথমবারের মতো গারোদের উপর খাজনা আরোপের ফলে সামাজিকভাবে সম্মিলিত অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়াটি রহিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গারোদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা প্রসার লাভ করে, শ্রম বিভাজন, পেশাগত দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় পেশাগত এবং অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে।

৬.২ ঐতিহ্যবাহী পেশা

ঐতিহ্যবাহী পেশা বলতে এখানে সেই সব পেশাকে বোঝানো হয়েছে যে সব পেশাকে গারোরা যুগ যুগ ধরে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তারেদ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। যেমন, জুমচাষ, মৎস্যশিকার প্রভৃতি। নিয়ে উৎরাইল গ্রামের গারো সমাজে প্রচলিত গোষ্ঠী, গোত্র এবং পরিবারের ঐতিহ্যবাহী পেশা সম্পর্কে একটি তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী-১৯ গারো সমাজে গোষ্ঠী, গোত্র এবং পরিবারের ঐতিহ্যবাহী পেশা

পেশা	গোষ্ঠী	গোত্র	পরিবার
১। কৃষি	৪৮ (৮৪.২%)	৪৮ (৮৪.২%)	৩৬ (৬৩.২%)
২। জুম	-	-	২ (৩.৫%)
৩। কৃষি ও জুম	৭ (১২.৩%)	৭ (১২.৩%)	১২ (২১.১%)
৪। মৎস্যা শিকার	১ (১.৪%)	১ (১.৪%)	১২ (৩.৫%)
৫। কাঠ কাটা	-	-	১ (১.৪%)
৬। কাঠ মিস্ত্রী	-	-	২ (৩.৫%)
৭। চাকুরী	১ (১.৪%)	১ (১.৪%)	২ (৩.৫%)
মোট	৫৭	৫৭	৫৭

উৎস: মাঠ পর্যায়ে জরীপ-২০০৫

উপরের সারনী থেকে বলা যায় যে, ঐতিহ্যবাহী পেশা হিসাবে অধিকাংশ গোষ্ঠী এবং গোত্রের পেশা হচ্ছে কৃষি। স্বাধীন সুসং দূর্গাপুর রাজ্যে রাজবাড়ীতে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিল ১টি গোষ্ঠী এবং গোত্রের ব্যক্তিবর্গ। উৎরাইল গ্রামে কৃষি পেশাতে নিয়োজিত আছে ৩৬ টি (৬৩.২%) পরিবার। আগে থেকেই এরা সেচভিত্তিক কৃষিতে অভ্যস্ত ছিল। দু'টি পরিবার (৩.৫%) শুধুমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১২টি পরিবার (২১.১%) কৃষি এবং জুম চাষ উভয় ধরনের পেশাতে অভ্যস্ত ছিল। মৎস্য শিকার করত ২টি পরিবার (৩.৫%)। কাঠকাটাকে পেশা হিসাবে নিয়োছিল ১টি পরিবার (১.৪%)। কাঠমিস্ত্রী অথবা সূতার এর কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল ২টি পরিবার (৩.৫%)। সুসংরাজার বাড়ীতে, কার্যালয়ে এবং বিভিন্ন পদে চাকুরী করত ২টি পরিবারের (৩.৫%) সদস্যরা ।

৬.৩ পেশাগত ক্ষেত্রে গতিশীলতা

উৎরাইল গ্রামে পেশাগত ক্ষেত্রে গতিশীলতা একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে। বনাঞ্চল সমূহকে সরকারী সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা এবং জুম চাষ নিষিদ্ধ করার ফলে গারো জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে সেচকৃষিকে গ্রহণ করেছে যা গারো পেশাগত জীবনে গতিশীলতার সৃষ্টি করেছে। উচ্চশিক্ষার প্রসার, নগরায়ণ, বিভিন্ন NGO সমূহের বিভিন্ন উন্নয়ন এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা পন্য (সেবক/সেবিকা), বাবুর্চি, কাঠমিস্ত্রী, বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরী, সরকারী চাকুরী প্রভৃতি। বর্তমান পেশাগত অবস্থা জানার জন্য নীচের সারনীতে গৃহস্থালী

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানদের প্রধান আয়ের উৎস, মূল পেশা, সহকারী আয়ের উৎস প্রভৃতির একটি তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারনী -২০ গারো সমাজে গৃহস্থালী প্রধানদের বর্তমান পেশা:

বর্তমান পেশা	সংখ্যা	শতকরা
১। কৃষি	৩	৫.৩%
২। কৃষি প্রধান এবং অন্যান্য সহায়ক পেশা		
ক) কৃষিকাজ এবং দিনমজুর	৩	৫.৩
খ) কৃষিকাজ এর্ব কাঠকাটা	২	৩.৫
গ) কৃষিকাজ এবং কুটির শিল্প	৫	৮.৮
ঘ) কৃষিকাজ এং কাঠমিস্ত্রী	২	৩.৫
ঙ) কৃষিকাজ এবং তাঁতশিল্পী	৫	৮.৮
৩। অন্যান্য পেশা প্রধান এবং কৃষি সহায়ক পেশা		
ক) চাকুরী এবং কৃষিকাজ	৭	১২.৩
খ) শিক্ষকতা এবং কৃষিকাজ	৩	৫.৩
গ) সেবিকা এবং কৃষিকাজ	২	৩.৫
ঘ) রাত্রিকালীন প্রহরা এবং কৃষিকাজ	১	১.৭
ঙ) বাবুর্চী এবং কৃষিকাজ	২	৩.৫
৪। নগরমুখী পেশা		
ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী	৯	১৫.৮
খ) ব্যবসা (দোকানদারী)	৬	১০.৫
গ) ব্যবসা (ঠিকাদারী)	৩	৫.৩
ঘ) আনসার ব্যাটালিয়ন	২	৩.৫
ঙ) মজদুর পর্যবেক্ষক (সুপারবাইজার)	১	১.৭
চ) নিরাপত্তা প্রহরী (সরকারী)	১	১.৭
মোট	৫৭	১০০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে জরীপ-২০০৫

দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র কৃষিকে একমাত্র পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে (৫.৩%)। কৃষিকে প্রধান পেশা হিসাবে বিবেচনা করে অন্যান্য সহায়ক পেশাকে বেছে নিয়েছে ২৯.৯% । আবার অন্যান্য পেশাকে প্রধান করে কৃষিকে সহযোগী পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে (২৬.৩%)। উৎরাইল গ্রামটি শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং এর একাংশ পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার ফলে শহরমূখী পেশায় আছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক।

Dhaka University Institutional Repository

গারো সমাজের ঐতিহ্যবাহী পেশার সাথে বর্তমান পেশাগত অবস্থার তুলনা করলে দেখা যায় অতীতে এই গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানত ৭টি পেশাকে গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে তারা ১৭টি পেশাকে প্রধান জীবিকার উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছে। উচ্চশিক্ষার প্রভাব, এবং নগরায়ণ পেশাগত গতিশীলতাকে বেগবান করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। নিম্নে সারনী- তে গারো পেশাগুলো ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য পাচ্ছে।

৬.৪ অর্থনৈতিক কাঠামো

ঐতিহ্যগতভাবে গারো অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসাবে গরোদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই পরিস্থিতি তাদের বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উভর নির্ভরশীল করে তুলে।

৬.৪.১ আয়ের উৎসসমূহ

যে কোন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে তাদের আয়ের উৎস সমূহের উপর। গারো গৃহস্থালী সমূহ বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে থাকে। তাদের রয়েছে কৃষিজ এবং পশুসম্পদ যা তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান সহায়ক উৎস। নিম্নের সারনী তে উৎরাইল গ্রামের গারো জনগোষ্ঠীর আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ এবং আয়ের উৎস সমূহ দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী- ২১ উৎরাইল গ্রামের গারো জনগোষ্ঠীর আনুমানিক বাৎসরিক আয় ও আয়ের উৎসসমূহ

আয়ের উৎসের নাম	বাৎসরিক আয় (টাকায়)	শতকরা
১। কৃষিজ পণ্য		
ক) ধান	৩৫০০০	১.৭%
খ) সব্জি	১৭০৫০	০.৮%
গ) বাঁশ	১১০৫৬	০.৫%
ঘ) ফল	১২০০	০৬%
মোট	৬৪৩০৬	৩.০৬%
২। পশুপালন		
ক) মুরগী	২১৫০০	১.০৩%
খ) শুকর	২৩০০০	১.১%
গ) ছাগল	৭০০০	০.৩%
ঘ) কবুতর	১৪০০	০.০৬%
ঙ) হাঁস	৩০০০	০.১৪%
মোট	৫৫৯০০	
৩। কাঠ সংগ্রহ এবং কাঠকাটা	৪১৪৩০	২.০%
৪। কুটিরশিল্প (বাঁশ বেত)	৭১০০	০.৩%
৫। তাঁতশিল্প	১৯৭০	০.৯%
৬। মদ তৈরী	১২০০০ ২৫	০.৬%
৭। চাকুরী		
ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী	৮৬৪০০০	৪১.২%
খ) শিক্ষকতা	১০৮০০০	৫.২%
গ) সেবিকা, ডাক্তার	১৮২০০০	
মোট	১১৫৪০০০	
৮। ব্যবসা		
ক) ঠিকাদার	২৮৮০০০	২১.৬%
খ) দোকানদারী	৪৫২০০০	১৩.৭
মোট		৩৫.৩%
	৭৪০০০০	
মোট	২০৭৬৭০৬	১০০%

উৎস: মাঠ পর্যায়ে জরীপ-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎরাইল গ্রামে ১ বৎসরের মোট আয় হচ্ছে ২০৭৬৭০৬ টাকা। গ্রামটি শহর সংলগ্ন হওয়ায় এবং উচ্চশিক্ষার প্রভাবে এখানে সবচেয়ে বেশী আয় করেন চাকুরীজীবিরা যার পরিমাণ হলো ১১৫৪০০০ টাকা এবং যা মোট আয়ের (৪৬.৪%)। এরপর আয়ের একটা বড় অংশ আসে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে যার পরিমাণ ৭৪০০০০ টাকা (৩৫.৩%)। এই ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান। এই দোকানগুলো এই গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের ৩ জন ঠিকাদারী ব্যবসার সাথে জড়িত এদের বার্ষিক আয় ২৮৮০০০ টাকা যা গ্রামের বাৎসরিক আয়ের ২১.৬%। গারো অর্থনীতি কৃষি প্রধান হওয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এই গ্রামে সবচেয়ে বেশী আয় হয় চাকুরী এবং ব্যবসা থেকে যা বাংলাদেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক আয়ের দিক থেকেও ব্যতিক্রম। ব্যক্তি-এই গ্রামের গৃহস্থালীগুলোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা শুধুমাত্র একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি উপর নির্ভরশীল নয়। প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালীতেই বিভিন্ন বয়সের একাধিক ব্যক্তি আয় এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। বয়সের কারনে যারা কায়িক শ্রম দিতে পারেনা তারা বাসায় কোন না কোন কাজ করে পরিবারকে সাহায্য করে থাকে।

৬.৫ গারো অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তনের ধারা

সমাজের পরিক্রমায় এবং পেশাগত বৈচিত্র্যের সাথে সাথে গারো সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সংগঠনে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারা গারো জীবন ব্যবহার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে গারো অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের ধারা উল্লেখ করা হলো।

১) গারোদের পেশাগত জীবনে বহুবিধ পরিবর্তন এসেছে। যেমন-

   ক) প্রাচীন গুটি কয়েক পেশার পরিবর্তে বর্তমান গারো সমাজ জীবনে বিভিন্ন পেশার উন্মেশ ঘটেছে।

   খ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষার বিস্তার এবং নগরায়ণ পেশাগত এবং সমগ্র অর্থনৈতিক সংগঠণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করছে।

২) গারোদের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।

৩) গৃহস্থালীর উপার্জনকারী হিসাবে পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪) গারো অর্থনীতি প্রধানত কৃষিভিত্তিক হলেও অন্যান্য পেশাজীবি শ্রেণী অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখছে।

৫) শহর সন্নিকটে হওয়ায় এই গ্রামের নগরমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-সাত

রাজনৈতিক সংগঠন

৭.১ রাজনৈতিক সংগঠন

নৃবিজ্ঞানীদের মতে রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে কোন সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সমাজের সদস্যরা সামাজিক নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে নিয়ম পালনে বাধ্য করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পদের বন্টন প্রক্রিয়া তদারকি করা।

নৃবিজ্ঞানী Corol R Ember এবং Melvin Ember রাজনৈতিক সংগঠনের বর্ণণা দিতে যেয়ে বলেন "When anthropologist talks about political organization or political life, there are particularly focusing on activities and beliefs pertaining to territorial groups. Territorial groups, in whose behalf political activities may be organized, range from small communities (bands, villages) to large communities (town, cities) to multi local groups such as districts or regions, entire nations, or even groups of nations.

(Ember, 1993, 369)

রাজনৈতিক সংগঠন বলতে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য একটি নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা।

৭.২ রাজনৈতিক সংগঠনের ধরণ

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নৃ-বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক সংগঠনকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

ব্যান্ড রাজনৈতিক সংগঠন

ট্রাইব বা ক্ষুদ্র জাতি রাজনৈতিক সংগঠন

চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র

রাষ্ট্র

(আহমেদ ও চৌধুরী, ২০০৩, ২১৪)

ব্যান্ড বা দলগত সমাজ

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, ব্যান্ড হচ্ছে কিছু ব্যক্তিবর্গের একটা দল যারা সম্পর্কের দিক থেকে পরস্পর কাছাকাছি, একটা নির্দিষ্ট্য অঞ্চলে বসবাস করে এবং রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম। ব্যান্ড সমাজে সাধারণ মানুষজন একটা রাজনৈতিক একক হিসাবে কাজ করে থাকেন এর বাইরে বৃহত্তর অন্য

Dhaka University Institutional Repository

কোন রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কৃষি উদ্ভবের আগে খাদ্য সংগ্রহকারী প্রত্যেক সমাজেরই এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল। আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব এই ব্যবস্থায় নেই। বিচক্ষনতা, দক্ষতা এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে জ্ঞান থাকার মধ্যে দিয়ে একজন প্রধান অন্যদের সম্মান অর্জন করে থাকেন। সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়া হলো: ব্যান্ডের সকল প্রধান মানুষজন একত্রে আলাপ আলোচনা করেন। নেতা তা পরিচালনা করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপরতা দেখান। অনেক সমাজে নিজস্ব ভাষায় নেতাকে সম্বোধন করা হয় 'মুরুব্বী' বা জ্ঞানী (Headman) বলে। নৃবিজ্ঞানী ১০,০০০ বছর আগে এই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের আস্তিত্ব খুজে পেয়েছেন।

নৃবিজ্ঞানী এস্কিমোদের প্রত্যেক দলের মধ্যে এরকম প্রধান উপস্থিতি খুজে পেয়েছেন। সেই সব প্রধানকে অন্যরা মানতেন তাঁর দক্ষতা এবং সুবিচার করার মন মানসিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে। প্রধানের বিভিন্ন পরামর্শ দলের সদস্যরা মেনে চলেছেন।

ট্রাইব বা উপজাতি সমাজ

ট্রাইবাল বা জাতিগোষ্ঠাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কতগুলো সংঘ রাজনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে। নৃবিজ্ঞানীরা গোষ্ঠী বা ট্রাইর বলতে বুঝিয়েছেন কতগুলো ব্যান্ডের সমন্বয় সেখানকার সদস্যরা একই ভাষায় কথা বলে, একই সংস্কৃতি তাদের এবং একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানী মনে করেন উপজাতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমাজ মূলত পশুপালন এবং চাষাবাষ কেন্দ্রিক। এখানে জসংখ্যার আয়তন ও ঘনত্ব ব্যান্ড এর তুলনায় বেশী। ট্রাইর সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপজাতির মধ্যকার সংঘগুলোর মুল ভিত্তি জ্ঞাতিসম্পর্ক। গোত্র (ক্লান) এধরনের একটি সংঘ। আরেকটি সংঘ হচ্ছে অংশিত গোষ্ঠী সংগঠন।

১। রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হবার ক্ষেত্রে এই দুই সংঘের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ ছাড়াও সমবয়সীদের দল (Age set) যথেষ্ট তৎপর বলে অনেক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন।

ব্যান্ড সমাজের মত এখানেও নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিক নয়। ক্ষমতার তুলনায় এখানেও সামাজিক প্রভাই নেতৃত্বের মূল চালিকা শক্তি। সাধারণত দক্ষতা, বিচক্ষনতার মাপকাঠিতেই প্রধান নেতা নির্ধারিত হয়।

নৃবিজ্ঞানী মার্শাল সাহালনস (১৯৭২) এবং তারও আগে ইভান্স প্রিচার্ড (১৯৪০) আফ্রিকার টিড এবং নুয়ের সমাজের উপর এ নিয়ে গবেষণা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র

নৃবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিহীন ব্যবস্থার মধ্যে ব্যান্ড সমাজের চেয়ে উপজাতি সমাজকে উন্নত ভেবেছেন এবং চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রকে ভেবেছেন আরও উন্নত। বিবর্তনবাদী চিন্তার এভাবে এই রকম দৃষ্টিভাঙ্গ তৈরী হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্রমশ নিচু স্তর থেকে উচু স্তরে বর্ণনা করেছেন।

ব্যান্ড সমাজ
↓
ট্রাইব বা উপজাতি সমাজ
↓
চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র
↓
রাষ্ট্র ব্যবস্থা

ব্যান্ড এবং উপজাতিগত সমাজে সামাজিক নিয়ম কানুন রক্ষা এবং শাস্তিবিধানের শিথিল পদ্ধতি ছিল, মুখিয়াতন্ত্রে এই পদ্ধতিগুলো কঠোর এবং আড়ম্বর হিসাবে দেখা দেয়। অনেক নিয়ম-কানুন পাকাপক্তোভাবে তৈরী হয়। চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্রে আইন শৃঙখলা রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেয়া হয়। এই ব্যবস্থায় মর্যাদা ভেদে সমাজের সব মানুষের মধ্যে ভেবাভেদ তৈরী হয়। চীফডম বা মুখিয়াতন্ত্র বলতে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যেখানে সমাজের প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা নির্দিষ্ট থাকে, মর্যাদা এবং সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে এবং সমগ্র গোষ্ঠীর একজন আনুষ্ঠানিক প্রধান থাকেন যার শাস্তি দেবার কতগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা থাকে।

পলিনেশিয়া এবং আমেরিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলের জাতিগুলোয় দেখা গেছে প্রধানের সাথে যার আত্মীয়তা যত নিকট তার সামাজিক মর্যাদাও তত বেশী। প্রধানের মর্যাদার সাথে অন্যদের মর্যাদা সম্পর্কিত। প্রধানের ধনসম্পদের পরিমাণ অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী থাকে।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা

বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পৃথিবী ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। পূর্বতন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদশালীর অধিকতর সুবিধা এবং মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে রাষ্ট্রে ক্ষমতা এবং মর্যাদা উভয়ই সম্পদের সাথে সাথে বেড়ে যায়। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শক্তি বা বল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং অনেক শক্তিশালীভাবে কাজ করে। সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের হাতে নামান শক্তি সঞ্চিত থাকে। রাষ্ট্র সেটা প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করতে পারে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় লিখিত আইনের শক্তি বিশাল। আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে যাবতীয় কার্যক্রম লিখিত আইন দ্বারা পোক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ গারো সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন :

গারো সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের ধরন অত্যন্ত প্রকৃতির। একজন গ্রাম প্রধান যিনি আবার গোষ্ঠীরও প্রধান মূলত তাকে ঘিরেই রাজনৈতিক অনুষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহ আবর্তিত। অতীতে রাজা ছিলেন সব ধরনের দন্ডমুন্ডের মালিক। তাকে কেন্দ্র করে শাসন এবং বিচার কার্য সম্পাদিত হত। তাকে বলা হত "আখি নকমার" শাব্দিক অর্থ রাজ্যের রাজা। রাজ্য বড় হলে রাজা "সাংমি নকমা" বা গ্রাম প্রশাসক নিয়োগ করতেন। বর্তমানে রাজার অস্তিত্ব না থাকলেও গ্রাম প্রশাসকের অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে।

তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, উৎরাইল গ্রামে অতীতে চাষযোগ্য জমি ছিল তিনজন "নকমার" অধীনে কয়েকটি মাহারী সংগঠনের সদস্যরা জমি চাষবাসে অংশ গ্রহন করত। উৎপাদিত ফসল সবাই ভাগ করে নিত। বর্তমানে এরকম অবস্থা আর দেখা যায় না। শুধুমাত্র এই গ্রামে বায়োজ্যেষ্ঠ ৩ জন ধর্মাবল্মী গারো বসবাস করেন। তারাই ঐতিহ্য অনুসারে "গ্রাম নকমার" আচার অনুষ্ঠান সমূহ পালন করে থাকেন। অনুষ্ঠান পালন ছাড়া তাদের আর কার্যকরী কোন ভূমিকা নেই।

বর্তমানে উৎরাইল গ্রামের রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতোই। গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ "মাতব্বরের" ভূমিকা পালন করে। গ্রামের ছোট খাট সমস্যার সমাধান গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে 'মাতব্বদের' মাধ্যমে নিজেরাই সমাধান করে থাকে। এই মাতব্বরদের দুইজন আবার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। এই গ্রাম্য "সালিশ" এর মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না হলে তখন তারা ইউনিয়ন পরিষদের শরনাপন্ন হয়।

উৎরাইল গ্রামে গারোদের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠনের কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। কৃষিতে গোষ্ঠী মালিকানা এবং গোষ্ঠী অংশগ্রহন বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে গারোদের সনাতন রাজনৈতিক সংগঠন সমূহ বিলুপ্ত হয়। বর্তমানে এই গ্রামের সকল অধিবাসীরা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগনের মত সব ধরনের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহন করে এবং নির্বাচিত হয়।

৭.৪ রাজনৈতিক সংগঠনের পরিবর্তনের ধারা:

১। গারোদের উৎপাদনের গোষ্ঠী অংশগ্রহন বিলুপ্তির সাথে সাথে তাদের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠনও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২। বর্তমানে গারো জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মত সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করছে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় সরকার এবং প্রশাসনে রয়েছে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-আট

বিশ্বাস ব্যবস্থা

৮.১ ধর্মের সংজ্ঞা

পৃথিবীর সমাজেই ধর্মের বিশেষ প্রভাব এবং গুরুত্ব রয়েছে। সমাজভেদে ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থা এবং আচার অনুষ্ঠানে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তারপরেও বলা যায় ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রভাব ও গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী। বর্তমানে Geertz এর সংখ্যাটি সবচেয়ে বেশী আলোচিত। তিনি বলেন ধর্ম হচ্ছে একটি প্রতীক ব্যবস্থা যেটি মানুষের মধ্যে শক্তিশালী, ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী মন-মেজাজ এবং প্রেষণা তৈরীতে ক্রিয়াশীল। অস্তিত্বের একটি সাধারণ বিন্যাস সম্পর্কে ধ্যানধারণা সৃষ্টির সাহায্যে ধর্ম এই ধারণাসমূহকে বাস্তবতার এমন একটি আবরণে ঢেকে দেয় যার কারণে সৃষ্ট মন-মেজাজ এবং প্রেষণাসমূহ অনুপমভাবে বাস্তবসম্মত মনে হয় "A religion is a system of symbols which act to establish powerful, pervasive and long-lasting moods and motivations in men by for mutating conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic" Geertz 1973,90) উৎস আহমেদ ও চৌধুরী ২০০৩, ২৯৯

৮.২ গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস

অতি প্রাকৃত শক্তির প্রতি ভয় এবং বিশ্বাস হচ্ছে গারো আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি। তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম "সাংসারেক"। জেংচামের মতে গারোদের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রায় অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ। তাদের বিশ্বাস আদিতে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড জলময় এবং ঘোর অন্ধকারাছন্ন ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রধান দেবতা টাটারা-রাবুগা তার সহচর নত্তুনপান্তু ও অন্যান্য দেব-দেবীর সহায়তায় পৃথিবী, আকাশ-মন্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র, সাগর-রাজি, পর্বতমালা নানা জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। শুধু বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেই তিনি তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেন নি। সৃষ্টির সাথে সাথে সৃষ্ট প্রানীসহ মানব সমাজের নানাবিধ মঙ্গল সাধন করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব। টাটারা-রাবুগা ছাড়াও গারোদের উপাস্য প্রধান প্রধান দেব-দেবীর তালিকায় রয়েছে সালজং, চুরাবুদি, কলকামে, গোয়েরা, আসিমা, ছিংসিমা, টংরেমা, সালবামন, উদুম প্রভৃতি। এই সব দেব-দেবীর কারও দায়িত্ব মানুষকে বিষয় সম্পদে সৌভাগ্যশীল করা আবার কারও কাজ মানুষকে নানাবিধ রোগ ব্যাধি প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া (জেংচাম, ১৯৯৪:৬৭)।

Dhaka University Institutional Repository

গারোরা মানবদেহে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সেই আত্মা যে অবিনশ্বর এটাও তারা বিশ্বাস করে। গারোরা আত্মার জন্মবাদে বিশ্বাসী। পৃথিবীতে বসবাসকালে যে যে রকম সৎকর্ম কিংবা পাপকর্ম করেছে সেই অনুপাতে আত্মা পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন রূপে বার বার জন্মগ্রহণ করে থাকে। সেই জন্মগ্রহণ কখনও মানুষরূপে, কখনও মানবেতর প্রাণীরূপে, আবার কখনও বা বৃক্ষলতারূপে হতে পারে।

গারোদের বিশ্বাস এই যে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিদেহী আত্মা প্রথমে চিকনাং পাহাড়ে যায় এবং সেখানে অবস্থানরত ইতোমধ্যেই মৃত তার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাময়িক অবস্থান করে। পরবর্তীতে তার জাগতিক কর্মফল অনুযায়ী সে মানুষ অথবা কোন প্রাণী বা বৃক্ষরূপে পূণ জন্মগ্রহণ করে। আর বিদেহী আত্মা যদি পুতপবিত্র হয় তবে সে অজানা চিরশান্তিময় অনন্তলোকে যাত্রা করে।

গারোদের মধ্যে সাংসারেক ধর্মাবলম্বীরা খুবই ধর্মপ্রান হয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে সব ধরনের অসুস্থ্যতা, দুর্ঘটনা, অপঘাতে মৃত্যু এসব দুষ্ট আত্মার প্রভাবে ঘটে থাকে। দুষ্ট আত্মার প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন পশু-পাখি উৎসর্গ করে অর্থাৎ বলি দেয়।

গারোরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করে। সেজন্য তারা প্রকৃতিকে ঘিরে বিভিন্ন পূজা-অর্চনা করে থাকে। সাংমা লক্ষ করেন যে, গারোরা বিশ্বাস করে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো শুধু তাদের পূজা-অর্চনার প্রধান বিষয়বস্তুই নয়, অতিপ্রাকৃত শক্তি এইসব প্রাকৃতিক ঘটনা ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একমাত্র প্রাণী উৎসর্গ করার মাধ্যমেই এই অতিপ্রাকৃত শক্তির অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব (সাংমা, ১৯৮১:২৩৫)। অতএব, সাংসারেক গারো অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বিশ্বাস করে এবং ভয়ও পায়।

বর্তমানে গারোদের ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। একসময় উৎরাইল গ্রামে অধিবাসীদের সবারই ধর্ম ছিল সাংসারেক। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তারা উদ্ভূত পরিবর্তনশীলতায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। নিম্নের সারনী গবেষিথ এলাকার উত্তরদাতাদের বর্তমান ধর্ম বিশ্বাসের অনুসরণের একটি তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো। বর্তমানে এই গ্রামে মাত্র ৩ জন সাংসারেক ধর্মাবলম্বী রয়েছে। বাকী সবাই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। ৫৭টি গৃহস্থালীর মধ্যে ৫৪টি খৃষ্টান,মাত্র ৩টি গৃহস্থালীর ৩জন গৃহস্থালী প্রধান সাংসারেক এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খৃষ্টান।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী -২২ উত্তরদাতার অনুসরনকারী ধর্মবিশ্বাস

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা
খৃষ্টান	৫৪	৯৪.৭৪%
সাংসারেক	৩	৫.২৬%
মোট	৫৭	১০০%

উৎস- মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

সারনী ১৯ এ দেখা যাচ্ছে যে ৫৭ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৪ (৯৪.৭৪%) জন খৃষ্টান এবং ৩ (৫.২৬%) জন সাংসারেক আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই ৩ জন গৃহস্থালী প্রধানের মধ্যে ২ জন বিধবা মহিলা, ১ জন পুরুষ, এদের ছেলেদের আত্নীয় স্বজন কেউই সাংসারেক ধর্মালম্বী নয়। আরও লক্ষ্যনীয় যে এই গ্রামের ৫৬০ জন গারো অধিবাসীদের মধ্যেও এই ৩ জনই সাংসারেক গারো।

এই অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সময়কাল ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এ সময়ে রেভারেন্ড বিয়ন রাজকুমার ও গঙ্গাচর সুসং দূর্গাপুরের আশেপাশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এ অঞ্চলে রাধানাথ গারো সর্বপ্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। ১৮৮১ সালে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় দূর্গাপুর থানার বনগ্রামে। বনগ্রাম উৎরাইল গ্রামটির পাশে অবস্থিত। ১৮৯০ সালের ১৭ই এপ্রিল ব্যাপাষ্টিদের প্রথম বার্ষিক "বড়সভা" অনুষ্ঠীত হয়। ১৮৮৯ সনে উৎরাইল গ্রামে জয়নাথ চৌধুরী অষ্ট্রেলীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ অঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নেন। ১৮৮০ সনে সর্বপ্রথম গারোদের জন্য এ অঞ্চলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ সালে এ অঞ্চলে একটি আধুনিক মিশনারী হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। আজ পর্যন্ত এ হাসপাতালটি সুনামের সাথে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। মিশনারীরা ধর্ম প্রসারের সাথে সাথে গারোদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য স্কুল, ক্লিনিক ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। গারোরা খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি অবহেলা দেখাতে শুরু করে যার ফলশ্রুতিতে তারা যথাযথভাবে গারো সংস্কৃতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়।

৮.৩ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান সমূহ:

সাংসারেক গারোদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সবই কৃষির সাথে সম্পর্কিত। প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে "ওয়ানগালা" এবং "রাংচুপালা" । ফসল ঘরে তোলার আগে গারোরা দেবতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিভিন্ন রকমের ফল দিয়ে অর্থ বা মৌসুমের প্রথম ফল হিসাবে গাছে যা ধরে বা যে শস্য উৎপন্ন হয় তার কিছু অংশ সাধারনত দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করো । এই ধরনের উৎসব দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই ধরনের উৎসবকে গারোদের নিজস্ব ভাষায় বলা হয় "রাংচুপালা"। শাব্দিকভাবে "রাংচু" অর্থ চাল তৈরীর প্রস্তুতী, "পালা" অর্থ ছিটিয়ে দেয়া। এই উৎসবে প্রতিটি গৃহস্থালীতে বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন থাকে, সেই সাথে চলে মদপান।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে গারোরা এই উৎসব পালন করে। এই উৎসবে কোন নাচ থাকে না। নতুন চালের ভাত এবং শুটকী মাছ হচ্ছে এ উৎসবের প্রধান খাদ্য।

"ওয়ান গালা" হচ্ছে সালজং বা সূর্যদেবতার পূজা। এই সূর্য দেবতার দুটো অংশ-একটি সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ, অপরটি নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি। শুকর, গরু হাঁস মুরগী ইত্যাদি হত্যা করে নাচ-গান ও মদপানের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। পূজার প্রথম দিন ভোরে একটি কলা পাতায় শাক-সব্জী, ফল-মূল, আতপ চালের গুড়া, এবং পিঠা সালজং দেবতার উদ্দেশ্যে উঠানের পূর্ব দিকে রাখা হয়। হত্যা করা হাঁস-মুরগী, গরুও শুকরের রক্তও এই কলাপাতায় ছিটিয়ে দেয়া হয়। শস্যক্ষেতকে বিপদমুক্ত করার জন্য ক্ষেতের পাশে একটি বাঁশের তৈরী বেড়া স্থাপন করা হয়। অতঃপর পাঠা, বানর কিংবা ইঁদুরের মধ্য থেকে যে কোনো একটি প্রাণীর গলায় দড়ি বেধে সমস্ত গ্রাম ঘুরানো হয়। পরিশেষে দা দিয়ে এক কোপে সেই প্রাণীটিকে হত্যা করে বাঁশের বেড়ার পাশে বিদ্ধ করে রাখা হয়। গারোদের বিশ্বাস এতে অপদেবতা ভয় পায় এবং শস্যের কোনো ক্ষতি করে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওয়ান গালা উৎসব "নকমা" বা গ্রাম প্রধানের বাড়ী থেকে শুরু হয়, আবার নকমার বাড়ীতেই সমাপ্ত হয়। উৎসবের শেষ দিনে সবাই নকমার বাড়ীতে সমাবেত হয়। শেষ দিনের আগ পর্যন্ত সারা গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে চলে নাচ, গান ও মদপান। উৎসবের শেষদিনে নকমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বড় ঘরে সবাই সারিবদ্ধভাবে বসে, তাদের সামনে বসেন কামাল বা পুরোহিত। ঘরের কোনে বিশাল মাটির পাত্রে থাকে মদ। প্রত্যেককে আতপ চালের পিঠা দেয়া হয়, কামাল মন্ত্র পাঠ করেন এবং প্রত্যেককে মদ পরিবেশন করেন। সেই সাথে চলে নাচ-গান। এভাবে ওয়ানগালা উৎসবের সমাপ্তি হয়। গারোদের ঐতিহ্যবাহী অনেক ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে "ওয়ানগালা" প্রধান।

বর্তমানে গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলো বিশাল আয়োজনে পালন করা হয় না। এর কারন হিসাবে বলা যেতে পারে প্রথমত: সাংসারেক গারোদের সংখ্যা খুবই কম, দ্বিতীয়ত: গারোদের এই উৎসবগুলোতে অত্যধিক খরচ হয় এবং এতটা খরচ করা এখন অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না।

খৃষ্টান গারোদের মধ্যে খৃষ্টীয় সব প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান সমূহ পালন করতে দেখা যায়। এই গ্রামের গারোরা প্রতি বছর অন্যান্য খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মতো বড়দিন, ইস্টার সানডে,গুড ফ্রাইডে প্রভৃতি উৎসবগুলো পালন করে। ২৫শে ডিসেম্বর প্রতি বছর অত্যন্ত উৎসব মুখরভাবে বড়দিন পালন করা হয়। ঐ দিন নতুন কাপড় পরে সবাই চার্চে উপস্থিত হয়। প্রতিটি বাড়ীতে ভাল খাবার রান্না হয়। গ্রামবাসীরা একে অন্যের বাসায় বেড়াতে যায় এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৪ ধর্মীয় পুরোহিত

ঐতিহ্যবাহী সাংসারেক গারোদের ধর্মীয় পুরোহিতকে "কামাল" নামে অভিহিত করা হয়। কোন ব্যক্তি, যার ধর্ম এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে সেই "কামাল" হতে পারে। পুরোহিতকে অবশ্যই সব দেব-দেবীদের নাম এবং তাদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে হয়। সেই সাথে তাকে সব ধরনের ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়।

খৃষ্টান গারোদের ধর্মীয় পুরোহিত হচ্ছেন এই গ্রামে অবস্থিত ব্যাপটিষ্ট চার্চের ফাদার। প্রতিদিন সকালে প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর দিন শুরু হয়। তিনি প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে গারোদের খৃষ্ট ধর্মের বানী শোনান। প্রতি রবিবার সকালে ফাদার প্রার্থনা সঙ্গীতের আয়োজন করে থাকেন। এই গ্রামে তিনি খুবই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

৮.৫ গারো সমাজে অন্ধবিশ্বাস:

পৃথিবীর প্রতিটি সমাজেই অন্ধবিশ্বাসের অস্তিত্ব রয়েছে। গারো সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। ঐতিহ্যগতভাবে গারোরা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক প্রেতাত্মার মধ্যে কোন কোন আত্মা পরপোকারী আবার কোন কোন পরশ্রীকাতার বলে বিশ্বাস। তাই প্রেতাত্মাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাস গারোদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ গারোদের মাঝে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারনী: ২৩ প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস সম্পর্কে গারোদের মন্তব্য

বর্ণনা	হ্যাঁ	না	মোট
১। ভূত প্রেত। প্রেতাত্মা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।	১৫	৪২	৫৭
২। ঝাড় ফুক চিকিৎসা অলৌকিকভাবে প্রমাণিত হয়, যখন সবকিছু ব্যর্থ হয়।	১৭	৪০	৫৭
৩। এমন একজন ব্যক্তি অবশ্যই প্রয়োজনীয় যে আত্মা/প্রেতাত্মাদের কথা শোনাতে সক্ষম।	৫	৫২	৫৭
৪। কোন কিছু বা কাজ পবিত্র মনে শুরু করলে সেটা অবশ্যই সফল হয়।	৫৭	-	৫৭

উৎস মাঠ পর্যায় জরীপ-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

সারনী ২০ এ দেখা যাচ্ছে ৫৭ জনের মধ্যে ১৫ জন ভূত-প্রেতত্মা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করে।১৭ জন মনে করে সবা চিকিৎসা ব্যর্থ হলে ঝাড় ফুক বা লোক চিকিৎসা অলৌকিকভাবে প্রমাণিত হয়। ৫ জন মনে করে এমন একজন ব্যক্তি অবশ্যই সমাজে প্রয়োজনীয় যিনি প্রেতাত্মাদের কথা শোনাতে পারবেন অর্থাৎ তার কথা প্রেতাত্মারা শুনবে। সর্বোপরি সবাই মনে করেন কোন কাজ বা কিছু বিশ্বাস পবিত্র মন নিয়ে আরম্ভ করলে সফলতা পাওয়া যায়। এই তালিকাতে আরও দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ গারোই ৪২ জন, ভূত-প্রেত এবং প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে না। ঝাড়-ফুকে বিশ্বাস করে না ৪০ জন । প্রেতাত্মাকে কথা শোনাতে সক্ষম সমাজে এমন ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না ৫২ জন।

৮.৬ গারো বিশ্বাস ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারা

গারো সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস ব্যবস্থায় বিবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। নিম্নে কতিপয় পরিবর্তনের ধারা উল্লেখ করা হলো।

০১) গারো সমাজ তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান থেকে সরে এসেছে।

০২) যারা এখনও ঐতিহ্যবাহী সাংসারেক ধর্মে বিশ্বাসী তারা ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। এর কারণ হিসাবে বলা যায় প্রথমত: সাংসারেক ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। দ্বিতীয়ত: এই উৎসব-অনুষ্ঠান বেশ ব্যায় বহুল হওয়ায় ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যায়ভার বহন করা সব সময় সম্ভব হয় না।

০৩) অধিকাংশ গারো খৃষ্ট ধর্ম গ্রহন করার ফলে খৃষ্টীয় অনুষ্ঠান সমূহ ব্যাপকভাবে পালিত হচ্ছে। যেমন- বড়দিন, ইষ্টার-ডে প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৯

কৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবন

এ অধ্যায়ে গারোদের কৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বর্তমানে এইসব বিষয়ে পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- খাদ্যভ্যাস, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, পোষাক, অলংকার প্রভৃতি।

৯.১। খাদ্যভ্যাস

গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। সকাল, দুপুর এবং রাত তিন বেলাতেই বিভিন্ন তরকারী দিয়ে গারোরা ভাত খেয়ে থাকে। যে সময় ভাত খাওয়া হয় সেই সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে ভাত খাওয়ার সুন্দর নামকরণ করা হয়। যেমন সকালে ভাত দিয়ে নাস্তা করার নাম "মি ফ্রিং" বা সকালের ভাত। "মিশাল" অর্থাৎ দুপুরের ভাত এবং রাতের ভাত খাওয়ার নাম "মি আতাস"। অন্যদিকে উৎসব অনুষ্ঠানে যে ভাত পরিবেশন করা হয় তার নাম "মি ব্রেং" অর্থাৎ সুস্বাদু ভাত।

ভাতের সাথে মাছ, মাংস, ডাল, ডিম, বিভিন্ন রকমের শাকসব্জি, যখন ঋতুভেদে যা পাওয়া যায় তাই তারা আহার করে থাকে। সব্জির মধ্যে আলু, বেগুন, লাউ, মিষ্টি লাউ, কুমড়া, ধুন্দল, কাঁচা বাঁশের কলি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুটকী মাছ গারোদের খুবই প্রিয়। এই শুটকী তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরী করে থাকে। সব্জির মধ্যে বাঁশের কচি চারা ও মাশরুম তাদের প্রিয় খাবার। গারো সমাজে বিভিন্ন রকম পশু পাখির মাংস খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। পশুর মধ্যে শুকর, খাসি, পাঠা, গরু এবং খরগোসের মাংস খেতে তারা পছন্দ করে। পাখির মধ্যে রয়েছে হাঁস ও মুরগীর মাংস। তাদের অন্যান্য খাদ্য তালিকায় রয়েছে মাংস এবং কুচে মাছ।

গারোদের রান্নার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রান্নায় কোন তেল এবং মসলা ব্যবহার করা হয় না। তাদের মধ্যে গারোরা রান্নায় ক্ষার পানি ব্যবহার করে। এই ক্ষার পানি তারা নিজেরাই তৈরী করে। সাধারণত কাঁচা মরিচ, লবণ এবং ক্ষার পানির ব্যবহার করেই রান্না করা হয়।

গারোদের প্রধান পানীয় হচ্ছে মদ। গারোরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় মদ প্রস্তুত করে থাকে। মদ চুঁ, পচাই, চুলাই ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। মদ তৈরীর উপকরণের মধ্যে রয়েছে আতপ চালের গুড়া, মান্টি মিশকল নামে এক ধরনের ফলের রস, মরিচ, লবণ, পচা ভাত ইত্যাদি।

গারোরা ফল খেতে খুবই পছন্দ করে। তাদের পছন্দের ফলের তালিকায় রয়েছে আনারস, আম, জাম, বড়ই, খেজুর, কাঁঠাল, পেয়ারা, ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক বনজ ফল।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১.২। খাদ্যভ্যাসে পরিবর্তনের ধারা:

গারোদের অতিহ্যবাহী খাদ্যভ্যাসে বর্তমান সময়ে বেশ কিছু পরির্তন সাধিত হয়েছে। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

০১) বর্তমানেও গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। কিন্তু সেই সাথে রুটি, পাউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি খাদ্যও তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

০২) গারোদের পছন্দের খাদ্য তালিকায় শুটকী মাছ এখনও শীর্ষে। তবে আগে শুটকী তারা নিজেরাই প্রস্তুত করত। এখন নিজেদের প্রস্তুতকৃত শুটকীর সাথে সাথে বাজার থেকেও তারা বিভিন্ন রকম শুটকী কিনে থাকে।

০৩) রন্ধন প্রণালীতে গারোরা যে ক্ষার পানি ব্যবহার করে থাকে তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে আগে নিজেরাই প্রস্তুত করত। এখন ক্ষার পানির পরিবর্তে ব্যাপকভাবে খাবার সোডা ব্যবহার করা হয়।

০৪) বর্তমানে গারোরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যের পাশাপাশি বাঙ্গালী খাদ্যভ্যাসেও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাদের রন্ধন প্রণালীতেও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

৯.২। তৈজসপত্র

গারোদের জীবন যাপন সরল ও সাধারণ। সাধারণত তাদের ব্যবহৃত তৈজষপত্র খুব উল্লেখযোগ্য নয়। গারোরা ধাতব বাসনপত্রে খাবার খেতে পছন্দ করে। বর্তমানে তাদের চীনামাটি ও কাঁচের তৈজসপত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে পানি রাখার জন্য তারা মাটি কিংবা এ্যালুমিনিয়ামের কলস ব্যবহার করে। মদ তৈরী করার জন্য এবং মদ রাখার জন্য তারা বিভিন্ন বিশেষ ধরনের পাত্র ব্যবহার করে। এগুলো বাঁশ, মাটি, পিতল এবং কাঁসার তৈরী। রান্নার জন্য তারা মূলত: মাটি এবং কেরোসিন দুই ধরনের চুলাই ব্যবহার করে।

৯.২.১। তৈজসপত্র পরিবর্তনের ধারা

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কিছু তৈজসপত্রের সাথে সাথে আধুনিক সব ধরনের তৈজষপত্রই বর্তমানে গারোরা ব্যবহার করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৩। আসবাবপত্র

গারোদের আসবাবপত্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতই বিছানাপত্র, পাটি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যায়। চেয়ার, টেবিল, আলমারি, খাট প্রভৃতি প্রায় সব বাড়িতেই আছে। অবস্থাসম্পন্নদের বাড়িতে সোফা, খাবার টেবিল, ষ্টিলের আলমারি, শোকেস, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্রও রয়েছে।

৯.৩.১। আসবাবপত্রে পরিবর্তনের ধারা

আধুনিক যুগে গারোদের আসবাবপত্রের ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। আগে যেখানে সব বাড়িতে শুধু পাটির ব্যবহার ছিল। এখন সেখানে খাট-পালং এর সাথে লেপ-তোষকের ব্যবহারও শুরু হয়েছে। বৈদ্যুতিক সামগ্রী কম বেশী প্রায় সব বাড়ীতেই দেখা যায়। এই গ্রামে বাণিজ্যিকভাবে একটি ডিশ এন্টিনা বসানো হয়েছে যেখান থেকে অনেকেই সংযোগ নিয়ে স্যাটেলাইট সংস্কৃতি উপভোগ করছে। আর এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা দ্রুত বৃহত্তর সংস্কৃতির সংস্পর্শে চলে আসছে।

৯.৪। পোষাক

গারোদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোষাকের নাম "দকমান্দা"। এটা মূলত: মহিলাদের পোষাক। দকমান্দা দেখতে অনেকটা শাড়ীর মতোই তবে তা দৈর্ঘ্যে শাড়ীর চেয়ে অনেক কম। এর বুনন বৈশিষ্ট্য গারোদের নিজস্ব। এর মধ্যে সূতা দিয়ে বিভিন্ন শিল্প কর্ম চিত্রিত হয় যার মাধ্যমে গারোদের নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

গারো পুরুষদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোষাক বলতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। গারো পুরুষরা লুঙ্গি পরে থাকে। অতীতে এই লুঙ্গি তারা নিজেরাই প্রস্তুত করত। বর্তমানে বিভিন্ন বয়সের গারোরা নির্বিশেষে লুঙ্গি পরে থাকে।

৯.৪.১। পোষাকে পরিবর্তনের ধারা

"দকমান্দা" গারো মহিলাদের নিজস্ব পোষাক হলেও বর্তমানে মহিলারা শাড়ী এবং সেলোয়ার-কামিজে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। পুরুষরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতোই লুঙ্গি পরে থাকে। শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে শার্ট-প্যান্ট অধিকতর জনপ্রিয় পোষাক।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৫। অলংকার

গারোরা অলংকার খুবই পছন্দ করে। ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই অলংকার পরে থাকে। ঐতিহ্য অনুসারে রূপার গহণার প্রচলন রয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়েই শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুটো করে গহনা পরে। তারা বিশ্বাস করে শরীরের বিভিন্ন অংশ ছিদ্র করলে অপদেবতা নজর দিবে না ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। এই বিশ্বাস থেকে তারা কানের বিভিন্ন অংশ ছিদ্র করে "রিং" জাতীয় দুল পরে থাকে। হাতে লোহা, তামা, রূপা ও কাসার তৈরী আংটিও ব্যবহার করে।

মেয়েরা রূপার টাকা, আধুলী, সিকি এবং ধান সদৃশ তাবিজের মালা পরে। কান, হাতের বিভিন্ন অংশ, কোমর, পায়ের গোড়ালী প্রভৃতি স্থানে তারা গহনা পরে থাকে। বিবাহিত মেয়েরা হাতে শাখা পরে। এছাড়া গারোদের মধ্যে পুতি এবং কড়ির মালা পরার প্রচলন রয়েছে।

৯.৫.১। অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা

অলংকারের প্রতি সার্বজনীন আগ্রহের অংশ হিসাবে আজও গারো মেয়েরা গহনা পরতে পছন্দ করে। বর্তমানে অবস্থাসম্পন্ন শিক্ষিত মেয়েরা সোনার গহনা পরতে পছন্দ করে। পুরুষরা খুব একটা গহনা পরে না। রূপার গহনা তাদের ঐতিহ্যবাহী হলেও বর্তমানে এটা কিছুটা উপেক্ষিত।

৯.৬। চিকিৎসা ব্যবস্থা

রোগের চিকিৎসা, শস্যের ভালো ফলন, শত্রু দমন, প্রেম, বৃষ্টি আনয়ন, অতিবৃষ্টি রোধ, বন্ধাত্ব মোচন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে গাছের রস ও শিকড়ের ব্যবহার, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুক, তেল পড়া, পানি পড়া, বিভিন্ন নিয়ম পালন, পূজা-অর্চনার আয়োজন করা প্রভৃতি চিকিৎসা ব্যবস্থা ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এই প্রাচীন পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থায় কামাল, ওঝা, কবিরাজ, বৈদ্য প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

গারো মতে ধর্মীয় আদেশ ও সামাজিক প্রথা অমান্য করলে পাপ হয়। পাপের ফলে আত্মাবস্তুর অবমাননা হয়। আত্মাবস্তুর অবমাননা হলে দেহে আত্মা স্থির থাকতে চায় না। আত্মাবস্তু দেহে ঠিক না থাকতে চাইলেই বিভিন্ন রকম অসুখ বিসুখ হয়। অসুখের কারণ জানতে কামাল, বৈদ্য এবং ওঝারা বিশেষ নিয়মের সরণাপন্ন হন। খুব ভোরে কিংবা বিকালে রোগ নির্ণয়ের পর শুরু হয় রোগ অনুসারে তার চিকিৎসা।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে কামাল, ওঝা বা বৈদ্য সাধারণত ঔষধ হিসাবে বিভিন্ন গাছের রস ও শিকড়ের আশ্রয় নেন। সেই সাথে বিভিন্ন ঝাড়-ফুঁক, তেল পড়া ও পানি পড়া, দিয়ে থাকেন। যদি তিনি মনে করেন কারও যাদুর ফলে রোগী রোগাক্রান্ত হয়েছে তবে তিনি বিশেষ পদ্ধতিতে যাদু নষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

করে দেন। ফলে রোগী রোগমুক্ত হয়। গারোদের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রাণী উৎসর্গ করার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অপদেবতার দৃষ্টি থেকে বাঁচা এবং রোগমুক্তির জন্য প্রায়ই তারা কামালের মতামত অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বলী দিয়ে থাকে। আর এসব প্রাণীর মধ্যে মুরগী, শুকর ও পাঠা উল্লেখযোগ্য।

প্রত্যেক সমাজের মত গারো সমাজেও কিছু নিষেধাজ্ঞা (Taboo) প্রচলিত রয়েছে। সাধারণত তারা এগুলো মেনে চলে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে অসুখে আক্রান্ত হয় বলে তাদের বিশ্বাস (সাত্তার, ১৯৭৭: ৩৫) গারোদের কিছু নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হলো।

০১) হাতী হত্যা করা পাপ। কেউ এ কাজ করলে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে।

০২) "ওয়ানগালা" পূজার আগে তরমুজ, আদা, কুমড়া ইত্যাদি খাওয়া অনুচিত। কোন ব্যক্তি এগুলো খেয়ে ফেললে পেটে প্লীহা হবে।

০৩) ভগ্নিপতির কাপড় পরলে খোস, পাচড়া ও বসন্ত হয়।

০৪) কোন মেয়ে তার বড় ভাই, চাচা, মামা প্রভৃতি মরুব্বীদের কাপড় স্পর্শ করতে পারবে না। করলে শ্বেত কুষ্ঠ হবে।

০৫) ঠিক দুপুর বেলা গাছের নিচে ঘুমালে ভূত-প্রেত আসর করবে। (সাত্তার, ১৯৮০: ৬৯)

৯.৬.১। চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিবর্তনসমূহ

গারোদের প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা আজও টিকে থাকলেও গারো সমাজে তার খুব বেশী প্রচলন নেই। ১৯০০ সনে এ অঞ্চলে একটি আধুনিক মিশনারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এ অঞ্চলের গারোরা এ হাসপাতালে থেকে প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এ অঞ্চলে রয়েছে। বর্তমান গারো সমাজও আধুনিক চিকিৎসাকেই তাদের প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

৯.৭। শিক্ষা

গারোদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি শিকারের কলাকৌশল ও জুম চাষ পদ্ধতি। অর্থাৎ জীবনধারনের জন্য যেটুকু কলাকৌশল আয়ত্ব করা প্রয়োজন সেটুকু।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৭.১। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে গারোদের অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে গারোদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৭০%। চল্লিশ বছর বয়েশী গারোদের মধ্যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি নাই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সার্বজনীন শিক্ষা লাভের সুযোগের মূলে রয়েছে খ্রিষ্টান মিশনারীদের অবদান। খ্রিষ্টান মিশনারীররা ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে গারো অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ১টি করে বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানও যথেষ্ট ভাল। পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে যে শৃঙ্খলাবোধ এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয় তা ভবিষ্যতে একজন দায়িত্ববান নাগরিক হওয়ার জন্য খুবই সহায়ক। গারোদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হারও অনেক বেশী। বর্তমানে আনুমানিক ২০% গারো উচ্চ শিক্ষিত। উচ্চ শিক্ষিত গারোরা অধিকাংশই বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোতে কর্মরত।

৯.৮। বিনোদন

ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে প্রধান বিনোদন ছিল বিভিন্ন পূজার অনুষ্ঠানসমূহ। মোরগ লড়াই, পাঠার লড়াই, বিভিন্ন রকম খেলা যেমন তীর লক্ষ্যভেদ, বর্শানিক্ষেপ প্রভৃতি ছিল প্রধান বিনোদন।

৯.৮.১। বিনোদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা

বর্তমানে আধুনিক বিনোদনের সবধরনের সুযোগ সুবিধা গারো অধ্যুষিত অঞ্চলে রয়েছে। এই গ্রামে প্রায় প্রত্যেকের কাছে রেডিও রয়েছে যা তাদের বিনোদনের পাশাপাশি ঘটমান সংবাদগুলো পৌঁছে দিচ্ছে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই টেলিভিশন রয়েছে। আর্থিক দিক দিয়ে ভাল অবস্থাসম্পন্নদের বাড়িতে রয়েছে রঙিন টেলিভিশন। ফলে প্রতিদিনের সংবাদ তারা নিয়মিত দেখতে পারে। এই গ্রামে ১টি ডিশ এন্টেনা রয়েছে যা একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন। এখান থেকে সংযোগ নিয়ে অনেকেই স্যাটেলাইট বিনোদন উপভোগ করছে। এই গ্রামের খুব কাছাকাছি অবস্থানে ১টি সিনেমা হল রয়েছে যা এ অঞ্চলের গারোদের আরেকটি বিনোদনের উৎস।

৯.৯। নগর সংস্পর্শ

ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজে অতীতে গারো জনগোষ্ঠীর সাথে নগরের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ ছিল। কোন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শহরের বাজারে কিছু নির্দিষ্ট পণ্য কেনা বেচা করাই ছিল নগরের সাথে গারোদের একমাত্র সংস্পর্শের কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৯.১। নগর সংস্পর্শ ক্ষেত্রে পরিবর্তন

বর্তমানে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে গারোরা অধিকতর নগর জীবনের নৈকট্য লাভ করছে। রেডফিল্ডের মতে নগর কেন্দ্রিকতা গারোদের মধ্যে "বৃহত্তর ঐতিহ্য" হিসাবে দেখা দিয়েছে যা তাদের "ক্ষুদ্র ঐতিহ্য" কে ক্রমাগত প্রভাবিত করছে। (ইসলাম, ১৯৮৬: ৪০)।

সমাজতাত্ত্বিকভাবে বলা যায় নগর গঠিত হয় নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে যা গ্রামীণ গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে স্থানকে কেন্দ্র করে একটি পৌরসভা গঠিত হয়েছে এবং একটি নগর কমিটি কার্যকরী রয়েছে তাকেই নগর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে আরও রয়েছে সড়ক, সড়ক বাতি, পানি সরবরাহ এবং পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই স্থানগুলো সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র, এখানকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর পেশা অকৃষিজ এবং শিক্ষার হার উচ্চ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ জরীপ, ১৯৮১: ৩৫)।

উৎরাইল গ্রামটি দূর্গাপুর থানার অধীন। দূর্গাপুর উপজেলা কার্যালয় হচ্ছে শহরটির প্রধান কেন্দ্র। প্রশাসনিক একক হিসাবে এখানে নির্মিত হয়েছে রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাতৃসদন, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, বাজার প্রভৃতি। এখানে রয়েছে একটি পৌরসভা। যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে। ব্যক্তিগত এবং বেসরকারী সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে এখানে কিছু ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়েছে।

উৎরাইল গ্রামটি শহরের ঠিক পাশেই অবস্থিত। মূল থানা সদর থেকে এ গ্রামের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার। গ্রামের একাংশ পৌরসভার অধীন। এই গ্রামের অধিবাসীরা শহরের সাথে খুবই সম্পৃক্ত। গ্রামের অধিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য শহরের উপর নির্ভরশীল। শহরের সংস্পর্শ এই গ্রামের অধিবাসীদের নিত্য নৈমেত্তিক ঘটনা।

৯.১০। শিল্প, সাহিত্য ও অবস্তুগত সংস্কৃতি

গারোদের দৈনন্দিন জীবনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। নৃত্যগীত, বাদ্যবাজনা, রীতিনীতি, লোকাচার, সাধারণ শিল্পাচার সবই তাদের অবস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। তাদের শিল্প সাহিত্য যথেষ্ট বর্ণাঢ্য।

ঐতিহ্যবাহীভাবে গারোদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল মূলত: জুম চাষ ভিত্তিক। বর্তমানে জুম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ায় সে আচার-অনুষ্ঠান ও পূর্জাপাবন লুপ্তপ্রায়। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে গারোরা অতীতের অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বর্জন করছে। সঠিক সংরক্ষণের অভাবে অতীতের অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

৯.১০.১। শিল্প সাহিত্য ও অবুস্তগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারা

বর্তমানে সাংস্কৃতিক পূর্ণজাগরনের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং কিছুটা সফলতাও আসছে। এখন গারো বসবাসকৃত এলাকায় প্রতিটি গীর্জায় গারো বাদ্যযন্ত্রের সাথে গারো গান পরিবেশনার মাধ্যমে উপাসনা পরিচালনা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গারোদের প্রধান উৎসব "ওয়ানগালাকে" খ্রীষ্ট ধর্মের আংগিকে উদযাপন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গারোদের আদি বাদ্যযন্ত্রের সাথে গারো গান এবং নাচ অত্যন্ত আকর্ষনীয়। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমনকি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে তারা নাচ-গান করে থাকে। অনেকে মনে করেন গারো বাদ্যযন্ত্র এবং গারোদের সুর, তাল, লয় প্রভৃতি অনেক প্রাচীন এবং প্রাক বৌদ্ধযুগের। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

লুপ্ত প্রায় আদিবাসী সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের জন্যে ১৯৭৭ সালে সরকারীভাবে নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর থানার রিরিসির ইউনিয়নে একটি "উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গারো দৈনন্দিন জীবনে শিল্পকলার প্রভাব যথেষ্ট। ঘরবাড়ি, আসবাসপত্রসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রতিটি জিনিষপত্রেই শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় মিলে। কাপড়ে সূচী শিল্পের কারুকাজ নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। গারোদের নিজস্ব পোশাক দকমান্দা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। গারোরা তাদের সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিল্প সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলতে খুবই দক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় -দশ

উপসংহার

আলোচ্য গবেষণায় উৎরাইল গ্রামের গারো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষনের মূল লক্ষ্য ছিল গারো আদিবাসী গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী আর্থ-সামাজিক সংগঠন সমূহের ঘটমান পরিবর্তন সমূহের প্রসঙ্গিক বিষয়বস্তু। এই গবেষণাটিতে ঐতিহ্যবাহী গারো সমাজের পরিবর্তনশীলতায় বিশেষ ভূমিকা রাখে এরকম কিছু প্রধান কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে সমগ্র গবেষণাটির উল্লেখযোগ্য অংশ এবং পর্যবেক্ষণ উপস্থাপণ করা হলো।

বর্তমান গবেষণাটি একটি ক্ষুদ্র পরিসরের গবেষণা যা পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলার দূর্গাপুর থানাধীন বিরিসিরি ইউনিয়নের উৎরাইল গ্রামে। সমগ্র গ্রামে গৃহস্থালীর সংখ্যা ১২৩ টি। এর মধ্যে ১১৪ টি গৃহস্থালী গারো আদিবাসী গোষ্ঠীর, ৩টি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের, ৪টি হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং ২টি মুসলিম সম্প্রদায়ের। ৫৭টি গৃহস্থালী প্রধানের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ৪১টি গৃহস্থালী প্রধান পুরুষ এবং ১৬টি গৃহস্থালী প্রধান মহিলা। ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সসীমার মধ্যে রয়েছেন ১২জন গৃহস্থালী প্রধান যা সবচেয়ে বেশী সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। উত্তরদাতাদের ৪৩ জন বিবাহিত, ১ জন বিধবা ও ৪ জন তালাক প্রাপ্ত। গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ১২ জন, মাধ্যমিক শিক্ষায় ১৯ জন, এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় ৯ জন। স্নাতক এবং পরবর্তী পর্যায়ের উচ্চশিক্ষিত ৭ জন। উল্লেখ্য গৃহস্থালী প্রধানদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই অশিক্ষিত নয়।

সমাজ সবসময় পরিবর্তনশীল। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করে বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলার এবং স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তন তত্ত্বটি উপযোগী বলে মনে করা হয়েছে। সামনার এবং কেলার এর তত্ত্বটি অনেক বেশী সনাতন হলেও বর্তমান গারো সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। এই গবেষণায় দেখা গেছে গারো সমাজ বৃহত্তর সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন নীতিমালা প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে গারো সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে। গারো সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন, আধুনিক নাগরিক জীবনের সংস্পর্শ, শিক্ষার প্রভাব, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার সম্প্রাসারণ এবং আধুনিক গনমাধ্যমের প্রভাব। সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্বগুলোকে পর্যলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় এই তত্ত্বগুলো মূলত গঠিত হয়েছিল ইউরোপীয় সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে। রেনেসা যুগ, শিল্পবিপ্লব, ফরাসীবিপ্লব এবং উপনিবেশবাদ এর প্রেক্ষাপটে যা গারো সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনের গতিধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রেক্ষাপট। ফলে গারো সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর নিজস্বতার আলোকে।

গবেষণার যৌক্তিকতার আলোচনা থেকে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে একটি নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপনের ধরণের একটি চিত্র তুলে ধরা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে গারো আদিবাসীগোষ্ঠীর সমাজ জীবনে দ্রুত ঘটে যাওয়া এবং ঘটমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে সঠিক নির্দেশনার জন্য কিছু অনুকল্প গঠন করা হয়েছে। যেমন-

প্রথমত: বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী একটি রুপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন চাপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে।

দ্বিতীয়ত: গারো গোষ্ঠী দৃশ্যত তাদের ঐতিহ্যবাহী গোত্র, পরিবার এবং বিশ্বাস প্রথাকে হারাচ্ছে।

তৃতীয়ত: গারো নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে হারাচ্ছে। তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত গনমাধ্যম, নগরসংস্কৃতি ও জীবন-যাপন পদ্ধতির দিকে বেশী উন্মোচিত হচ্ছে।

চতুর্থত: ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গারোরা খৃষ্টধর্মকে গ্রহন করলেও বর্তমানে তারা ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, আনুষ্ঠানিকতা, রীতি-নীতি ও ব্যবহার ধরে রাখতে সচেষ্ট হচ্ছে।

বর্তমান গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণভাবে বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠীর অনুসন্ধানমূলক একটি অনুক্রমন গবেষণা যা পাঠক এবং নবাগত গবেষকদের মাঝে একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মত বাংলাদেশের ক্ষুদ্রগোষ্ঠীসমূহ প্রতিনিয়ত একটি পরিবর্তন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অভ্যন্তরীন এবং বহির্বিশ্বের বিবিধ চাপই এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বর্তমান গবেষণাটি একটি ক্ষুদ্র পরিসরে গারো সমাজের ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করছে।

গবেষণাটিতে বিভিন্ন নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গারো সমাজ জীবনের পরিবর্তনসমূহকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণাটির মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহন ছিল সম্পূর্ণ নৃবৈজ্ঞানিক এবং মূল চাবিকাঠি হিসাবে এখানে প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক ও গুনবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য নক্শাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-সংখ্যাগত প্রস্তাবসমূহ এবং গুনগত প্রস্তাবসমূহ। বিশেষ কিছু সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গবেষণার স্থান হিসাবে নেত্রকোণা জেলায় দূর্গাপুর থানার উৎরাইল গ্রামটি নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে- কেসষ্টাডি, জরীপ পদ্ধতি, এবং পরিসংখ্যান পদ্ধতি। গবেষণাটি অনুসন্ধান এবং বনর্ণামূলক প্রকৃতির হওয়ায় গুনগত এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক উভয় ধরনের কৌশল সংযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে নমুনায়ন হিসাবে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কেসস্টাডির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা। মুখ্য এবং গৌণ এই দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সুগভীর পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণাটিতে তথ্যকে প্রক্রিয়াজাত এবং বিশ্লেষণ করার জন্য গৃহীত তথ্য সমূহকে SPSS প্রোগ্রাম এর সাহায্যে কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। বর্ণনামূলক তথ্যসমূহকে একক চলক এর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তালিকা বর্ণনা এবং অন্যান্য তথ্য যা এই গবেষণা থেকে পুনরুৎপাদিত হয়েছে তা মূলত: প্রাথমিক সাক্ষাৎকার, অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার এবং অবস্থান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমূহের উপর প্রতিক্রিয়ার বিষয়বস্তু এবং উল্লেখযোগ্য অংশ। বর্তমান গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের সব নৃগোষ্ঠী সমূহের বর্তমান অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আরও আলোকপাত করা হয়েছে দেশের বর্তমান গারো জনগোষ্ঠীর প্রতিকৃতি সম্পর্কে। বর্তমানে বাংলাদেশে গারো অধিবাসীর সংখ্যা ১,০২,০০০ জন (বা. প. জ,১৯৯৯)। এরা মূলত ৮টি জেলায় বসবাস করছে। এগুলো হচ্ছে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, রংপুর, সুনামগঞ্জ, এবং সিলেট। যে কোন গোষ্ঠীর সামাজিক জীবন ভৌগলিক পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ভৌগলিক ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে নেত্রকোণা জেলা, দূর্গাপুর থানা, এবং উৎরাইল গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন চীনের উত্তর সিন-কিয়ং প্রদেশে গারোদের আদিনিবাস ছিল। অনুমান করা হয় বিভিন্ন সময়ে ভারতের মেঘালয়ে অবস্থিত গারো পাহাড় থেকে গারোরা পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশে বসবাস শুরু করে। গারো নামকরনের সঠিক কোন কারন জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন গারোদের অন্যতম শাখা গরা-গানচিংয়ের নাম অনুসারে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের গারো নামে সমম্বোধন করতে থাকে এবং কালক্রমে এই নামটিই প্রচলিত হয়। গারোদের স্থানীয় ভাষা মান্দি ভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এটা মূলত "সিনো টিবেটান" ভাষার অর্ন্তগত "বোডো" বা "বরা" ভাষা উপগোষ্ঠীর অর্ন্তগত একটি ভাষা। গারো আবাসের ধরণ হিসাবে বলা যায় সাধারণত গারোদের গ্রামগুলো গড়ে ওঠে নদী বা ঝরনার তীরবর্তী স্থানে এবং যতটা সম্ভব হিংস্রজন্তুর আবাস্থল থেকে দূরে। গারোদের ঘরগুলো নির্মিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ বাড়ীর মতো, তবে ঘরের বৈশিষ্ট্য এবং নির্মাণ পদ্ধতি, তাদের আদিনিবাশ, নামকরণ, ভাষা ও আবাসের ধরনে কিছুটা বিশেষত্ব আছে।

গারো সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় গারোরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পরিবর্তনে সচেষ্ট। সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ঐতিহ্যকে পাশ কাটিয়ে আধুনিকতার স্বর্শ পেতে বেশী আগ্রহী। খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ এবং বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে এসে তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষভাবে বলা যায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে প্রাপ্ত সামজিক ও অর্থনৈতিক সুবিদাসমূহ গারোদের আধুনিক সমাজব্যবস্থার প্রতি প্রলুব্ধ করছে। বৃহত্তর সমাজব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে গারো নৃগোষ্ঠী আধুনিক লোকরীতিকে গ্রহণ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। গারো নৃগোষ্ঠীর তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে পরিহার করে নতুন একটি সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পরিবার গঠনের প্রথম সোপান হিসাবে দেখা যাচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে গারো সমাজ তাদের ঐতিহ্যবাহি প্রথাকে বাদ দিয়ে খৃষ্টীয় প্রথা অনুসরণ করছে। আধুনিক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা নিজেদের পছন্দমত সঙ্গী নির্বাচন করছে। বিয়ের পর অনেকেই মাতৃবাসরীতির পরিবর্তে নয়াবাসরীতি পছন্দ করছে। অথবা কর্মক্ষেত্রের জন্য নয়াবাসরীতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনুপরিবারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সেইসাথে যোগ হয়েছে অনুসদৃশ্য পরিবার। গারো সমাজ মাতৃস্থানীয় হলেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা ক্রমশ: প্রভাব বিস্তার করছে। অতীতে গারোরা কখনও জন্মনিয়ন্ত্রণ পছন্দ না করলেও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে গারো সমাজে পরিকল্পিত পরিবার পুরোপুরি স্থান করে নিয়েছে। গোত্র সংগঠনের দেখা যাচ্ছে গারো নৃগোষ্ঠীর প্রধান গোষ্ঠী পরিচয় আজ বিলুপ্তির পথে। গারো নৃগোষ্ঠীর পরিচয়টি শুধু বর্তমান আছে। সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারণে মাচং (গোত্র) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখলেও ধর্মান্তরীত হওয়ার ফলে এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে মাহারীর (উপগোত্র) গুরুত্ব অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। ঐতিহ্যবাহি গারো সমাজের উত্তরাধিকার রীতিতে যেভাবে শুধুমাত্র কণিষ্ঠা কন্যা (নোকনা) মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো বর্তমানে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যান্য কন্যারাও (এগেইট) সম্পত্তির মালিকানা পাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানেরাও সম্পত্তির মালিকানা পাচ্ছে। সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রবেশ লক্ষণীয়।

গারোদের অর্থনৈতিক সংগঠনের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে গারো অর্থনীতি মূলত: কৃষিভিত্তিক। ভূমি মালিকানা গোষ্ঠী ভিত্তিক। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তারা সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে সনাতন গারো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষার প্রসার এবং নগরায়নের ব্যাপক প্রসারের ফলে অন্যান্য পেশার দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে। যা আয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এরফলে শহরমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ঐতিহ্যবাহীভাবে গারোদের রাজনৈতিক সংগঠন সরল প্রকৃতির। একজন গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে তারা রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত। বর্তমানে গারোদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের কোন অস্তিত্ব নেই। তারা বৃহত্তর সমাজের মতই বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রতিটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

আবার ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থা ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে গারো সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবস্থায়ও অমূল পরিবর্তন এসেছে। গারো সমাজ তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মাবিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে সরে এসেছে। বর্তমানে যেসব গারো ঐতিহ্যবাহী সাংসারেক ধর্মে বিশ্বাসী তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য হওয়ায় ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। অধিকাংশ গারো খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফলে খৃষ্টীয় অনুষ্টানসমূহ ব্যাপকভাবে পালিত হচ্ছে।

গারোদের কৃষ্টি ও দৈনন্দিন জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। খাদ্যভ্যাসের ক্ষেত্রে বলা যায় অতীতের মত আজও গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। সেইসাথে রুটি, বিস্কুট, প্রভৃতি খাবারও খাদ্যতালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এখন প্রাচীনধারার কিছু কিছু নিজস্ব তৈজষপত্রের সাথে আধুনিক সব তৈজষপত্র তারা ব্যবহার করছে। ব্যবহারর্য আসবাবপত্রের পরিবর্তন এসেছে। বৈদ্যুতিক সামগ্রীর ব্যবহার বাড়ছে। ঐতিহ্যবাহী পোষাকের সাথে সাথে বৃহত্তর সমাজের মত আধুনিক পোষাকেও গারোরা অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রাচীন ঝাড়-ফুক, তন্ত্র-মন্ত্রর পরিবর্তে আধুনিক উন্নত চিকিৎসা স্থান করে নিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গারোদের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রায় ৯০% গারো শিক্ষার আলোয় আলোকিত। বিনোদনের ক্ষেত্রে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। স্যাটেলাইট সংস্কৃতির প্রসারের ফলে গারো সমাজ দ্রুত বৃহত্তর সংস্কৃতির সংস্পর্শে চলে এসেছে। ব্যাপকভাবে নগর সংস্পর্শের ফলে নাগরিক জীবনের দিকে তারা ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্যান্য প্রভাববিস্তারকারী উপাদানের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন গারো সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করছে বলে মনে করা হচ্ছে, নাগরিক জীবনের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন কিভাবে গারো সমাজকে প্রভাবিত করছে এবং গারো সমাজ এই নগরায়নকে কেমন করে আতস্থ করছে এ বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করছি।

সাংস্কৃতিক ব্যপ্তিবাদ হচ্ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান প্রতিক্রিয়া যা বাংলাদেশের গারো আদিবাসী গোষ্ঠীতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে বহন করে বৃহত্তর সংস্কৃতির সাথে আত্তীকরণ, একত্রীকরণ, বহুমূখী সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব। এই সাংস্কৃতিক বিকীর্নতা মানবিক সম্পর্ক এবং উপযোজন এর ক্ষেত্রে একাধিক সমস্যার নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতীত কোন সঠিক অনুসন্ধান অচিন্তনীয়। সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ এবং নৃবিজ্ঞানীগন তাত্ত্বিক এবং অভিজ্ঞাতার আলোকে এই সাংস্কৃতিক বিকীনকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে ব্যাপক অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছেন কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক বিকীনতা এবং আত্মীকরণ আদিবাসী সংস্কৃতিকে পরিবর্তীত করছে, এছাড়া কিভাবে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে তাদের ঐতিহ্যগত পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। এই বিষয়সমূহের আলোকে বর্তমান গবেষণাটিতে বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানের পরিব্যাপকতার মধ্যে রয়েছে কিভাবে বাংলাদেশের গারো আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সংগঠনে পরিবর্তন আসছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে বেশী প্রভাব রাখছে। তাদের আত্মকেন্দ্রীকতার ধরনটি কেমন এবং কিভাবে তারা বৃহত্তর সমাজের সাথে আত্মীকরণ করছে। সমগ্র গ্রামীণ বাংলাদেশের সাথে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পার্থক্য কোথায়। এই প্রশ্নগুলো প্রধানত সাধারন অনুমান বা অনুকল্পের সাথে সম্পৃক্ত।

সর্বোপরি এই গবেষণা থেকে সাধারনত যে সব সিদ্ধান্ত এবং প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে তা হলো

প্রথমত: বাংলাদেশের গারো আদিবাসী গোষ্ঠী একটি রূপান্তর (transition) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন চাপ যেমন শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা, খৃষ্টধর্মের প্রভাব, রাজনৈতিক পরিবর্তন, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব চাপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠী দৃশ্যত তাদের ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী, পরিবার, সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি এবং বিশ্বাস হারাচ্ছে।

তৃতীয়ত: বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তর গোষ্ঠীগত পরিচয় হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে তারা বৃহত্তর একটি নৃতাত্বিক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে চলেছে।

চতুর্থত: গারো আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যকেও হারাচ্ছে। তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত গনমাধ্যম, নগরসংস্কৃতি ও নাগরিক জীবনযাপনের দিকে বেশী ধাবিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত: ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তারা খৃষ্ট ধর্মকে গ্রহণ করলেও বর্তমানে গারো নৃগোষ্ঠীর একটা সচেতন অংশ তাদের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ, আনুষ্ঠানিকতা ও রীতি-নীতিকে ধরে রাখতে সচেষ্ট হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী ঐতিহ্য এবং পরিবর্তিত এই দুই ধারায় মিলিত সুস্পষ্টভাবে মিশ্রিত একটি নৃগোষ্ঠী। আরও বলা যায় সময়ের সাথে সাথে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মূলধারার সাথে তারা সংযোজিত হচ্ছে। ধর্মীয় আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং নগরের আকর্ষণের ফলে গারোরা আজ বাংলাদেশের এক সময়ের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টান্ত হিসেবে যে পরিচয় অটুট রেখেছিল, তা হারাতে বসেছে। ফলশ্রুতিতে গারোদের সাংস্কৃতিক মননশীলতায় ব্যাপক পরিবর্তনও সংঘটিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

অঞ্জন ম্রং
১৯৯৯ "গারোদের বিবাহ ব্যবস্থার সেকাল একাল" সৃজন সাংমা (সম্পাদিত.) জানিরা, বিরিসিরি, নেত্রকোণা

Ahmed. K.G
1980 "Social Transformation in Bangladesh," in Md. Serajuddin (ed.,) Project Management, Managment Development Centre, Dhaka.

Ahmed Nafis
1968 Economic Geography of East Pakistan. Oxford Printing press, London.

Akhter. M.R. (ed)
1981 Agriculture in Bangladesh, Bangladesh Agricultural Development Corporation, Ministry of Agriculture and Forest, Government of Bangladesh, Dhaka.

Allen B.C
1909 **Inperial Gazetter of India**
Eastern Bengal and Assam.
_____ The To ttas. Assam Disstrict Gazetter. Vol. IV.
1905

আরেফিন, হে.খা.শা.
১৯৮৬ শিমুলিয়াঃ বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র কলা ভবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Aziz, K.M.A.
1978 "Marriage Practices in Rural Area of Bangladesh, Journal of the India Anthropological Society, Val. 13.1.

আচার্য জয়ন্ত (সম্পা)
২০০৫ আদিবাসী জনপথের পথে প্রান্তরে। শ্রাবণী, প্রকাশনী, ঢাকা।

Bangladesh Bureau of Statistics,
1981 Census 1981 (Preliminary Report), Statistics Division, Minstry of Finnance and Planning, Government of Bangladesh, Dhaka.

_____
1991 Statistical Year Book of Bangladesh, 1991 (Brief), Statistics Division, Ministry Finnance and Planing, Government of Bangladesh.

2000 Census 2000. Government of People's Republic of Bangladesh, Ministry of Finance and Planing, Statistics Division, Dhaka.

2002 Statistical Year Book of Bangladesh, 2002, Statistical Division, Ministry of Finance and Planning, Government of Bangladesh, Dhaka.

Beteille, Andre
1965 Caste, Class and Power, University of California Press, California, USA.

Bogdan, R. and Taylor JS
1975 Introduction to cualictive Research Methods, New York, Wiely, USA.

Dhaka University Institutional Repository

Bonerja, B. 1929	**Materiels for the Study of Garo Ethnology, Indian Antiguary, Vol-5.**
Bose, J.K. 1980	Glimpses of Tribal Life in North East India, Institute of Social Research and Applied Anthropology, Kolkata, India.
Bangladesh Indigenous Peoples Forum 2003	Ensure the Security of Indigenous Women Solidarity, Dhaka.
Bose, Nirmal Kumar 1971	Tribal Life in India, National Book Trust India, New Delhi.
Boyce, K. James and Hartman Betay 1970	Needless Hunger: Voices for a Bangladesh Villege, Institute for Food and Development Policy, San Francis Co, U.S.A.
Butmer Martin (ed) 1977	Sociological Research Methods, The Macmillan Press Ltd, London.
Burling, Robbins 1963	Rangsanggri: Family and Kinship in a Garo Village, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, U.S.A.
1997	The Strong Woman of Madhupur, The University Press Limited, Dhaka.
Bertocci, Peter J. 1970	Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan, Unpublished PH.D Thesis, Mihigan State University, U.S.A.
বারেন্দ্র ব্রং ১৯৯৩	বাংলাদেশের খ্রীষ্ট ধর্ম ও গারো সমাজ, সৃজন সাংমা (সম্পা), জানিয়া, উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিসিরি, নেত্রকোনা।
চাকমা, সুগত ২০০২	বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা।
Chatteriee 1961	Sensus of India, Dr. B.K. Roy Barman ed, Vol. I, Monograph Series-Part V-B. India.
Chowdhury, A. 1978	A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification, Centre for Social Studies, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

1986 — Micro Level Village Sudies in Bangladesh: A Plea Anthropological Approach in Hasnat A Hye (ed:) in Bangladesh. (Comilla B A R D Vol –1

1985 — Pains and Pleasures of Field Work, National Institute of Local Govt, Dhaka.

চৌধুরী, আ. এবং রশীদ, সাইফুর ১৯৯৫ — নৃবিজ্ঞান: উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Costa, E.T 1847 — Some Accounts of the Garrow Tribes of the Valley of Assam, Calcutta, India.

1872 — Descriptive Ethnology of Bangal, Calcutta, India.

দ্র, সজীব ২০০৪ — গণতন্ত্র, সুশাসন ও বাংলাদেশের আদিবাসী, সূচীপত্র, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Dube, S.C (ed) 1977 — Tribal Heritage of India. Vol-1, Vikas Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi, India.

Durkheim, Emil 1956 — Education and Sociology.Translated by S.D. Fox Illionis, Free Press.

Esme, 1885 — The Garos, Their Customs and Mythology, Calcutta Review. Lxxx, India.

Ember, Carol. R. and Ember, Melvin, 1993 — Anthropology Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. U.S.A.

Frende, Marcus 1982 — Bangladesh: The First Decade. South Asia Publishere Pvt. Ltd, New Delhi, India.

Frazar. J.G — The Worship of Nature. Vol-1London.

Fr. Jot. Gomage, A — Catholic Celender (Bangeli Version). Protibashi Publishers Dhaka.

Organization (FAO) 1973 — Development Brief Cited in First Food.

Fuchs Stephen, 1973 — The Aboriginal Tribes of IndiaMacmillon, India.

Gain Philip. 1995 — Bangladesh Land Frest and Forest People, S E H D. Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

Goswami and Majumder 1972 — Social Institutions of the Garo of Megalaya.Debabharat Pulishers, Calcutta, India.

Hunter, W.W 1875 — A Statistical Account of Bangal, Vol-V, Truiner and Co, London.

Hye A. Hasnat 1982 — Agrarian Reform for Bangladesh, Bangladesh Administrative Staff College, Dhaka.

Islam, Zahidul 1986 — A Garo Village in Bangladesh: A Socialogical Study, Benaras Hindu University Varanasi, India.

——— 1991 — The Garos of Bangladesh: An Overview

——— 1992 — Social Organization Among the Garos in Bangladesh. An Overview.

——— 1998 — হাজংদের সমাজ ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিন্যাস: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

Jahangir, B.K. 1979 — Differentiation, Polarisation and Confrontation in Rural Bangladesh, Social Studies, Dhaka University, Dhaka.

জেংচোম, সুবাস- ১৯৯৪ — বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়

Jha, Makhan 1994 — An Introduction to Social Anthropology, Vikas Publishing House Pvt Ltd, New Delhi, India.

Johnson, M.J 1975 — Doing Field Research, The Fress Press Limited, New York, U.S.A.

Kar, P.C 1967 — A Point of View on the Garo in Transition, Ralhin Mithra and Barun Das gupta (ed), A Common Perspective for North East India Pannalal Das Gupth, Calcutta, India.

——— 1982 — The Garo in Transition, Cosmo Publication, New Delhi, India.

Karim, A.K.N 1961 — Changing Society in India. Pakistan and Bangladesh.

করিম, নাজমুল ১৯৭২ — সমাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Kattakayam, V.J 1983 — Social Structure and Change Among the Tribals. D.K. Publications, Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

খালেক, আবদুল সরকার, নীহারঞ্জন রহমান, আজিজুর
১৯৯০
সামাজিক বিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি, সানফ্লাওয়ার কম্পিউটার সার্ভিসেস, ঢাকা।

Khaleque, Kibriaul
1982
Social Change Anong the Garo: A study of a Plain Village in Bangladesh, (MA thesis)

———
1983
Adoptation of Wet-Cultivation and Change in Property Relations Among the Bangladesh Garo, B.K. Jahangir (ed) The Journal of Social Studies, No-20, Dhaka.

———
1983
Garo Kinship Terminology: Idealization and Reality, A.F Salahuddin Ahmed (ed), The Dhaka University Studies, Vol. xxxix, Dhaka.

কামাল, মেজবাহ
১৯৯৭
উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের সমস্যাবলী গণসুনানী ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা।

Koenig, Samuel
1957
Sociology: An Introduction, to the Science of Society, Barnes and Noble, INC. New York, U.S.A.

Lowie, R.W.
1920
Primitive Society, Routledge and Paul, London.

Majumder, D.N.
1972
A Study of Tribe-Caste Continue and the Process of Sanakritization among the Bodo Speaking Tribes of the Garo Hills, K. Swresh (ed),

Tribal Situation in India. Proceedings of a seminar, Indian Institute of Advance Study, Simla, India.

Majumder, D.N and T.N Madan
1967
An Introduction to Social AnthropologyAsia Publishing House, Bombay, India.

Majumder, D.N and Kar. P.C.
1979
"The Changing Role of the Nokma in Garo Hills" and "The Aking Polity among the Garos. "Both Seminar on Social and Political Institutions of the Hill People of North-East India, 4-5 July Aruvind Das V. Nilakant (ed), Agrarian Relation in India, Manohar, India.

মজুমদার, কেদারনাথ
১৯০৬
ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরন, সানীহ এন্ড কোং, কোলকাতা, ভারত।

Marak, J.K.R.
2002
Garo Customary Laws of Inheritance and its Inportance in Present Day, Globatext.

Malinowslci
1992
Argonauts of the Western Pacific.

Dhaka University Institutional Repository

Morgan L.H 1997	Ancient Society, Calcutta India.
Marris, Desmond. 1967	The Naked Ape, New York, U.S.A.
Mihanovich, Schnepp. Thomas –1952	Marraige and the Family, The Bruce Publishing Company, New York, U.S.A.
Mukherjee, Bhabananda 1955	"Machong among the Garos of Assam," Eastern Anthropology, Vol-9, India.
_____ 1974	"Machong Among the Garo," K.S Mathur (ed), Tribe Caste and Peasantry, Ethnographic and Folk Culture Society, Lucknow, India.
_____ 1957	"Garo Family," Eastern Anthropologist, XI-No-1.
Murdock. G. P 1949	Social Structure, Macmillon Co, New York, U.S.A.
_____ 1965	Culture and Society.
Nakne Chie 1967	Garo and Khasi, Mouton and Company, Paris, U.S.A.
Nawaz. Ali 1984	"Garo Society in Tronsition"
_____ 1982	" A Matriarchal Hill Tribe of Bangladesh: Their Land Tenure and Economy, " Anworul Karim (ed), Folklore, Folklore Research Institue, Kushtia. Bangladesh, Vol. VII. January.
Nazi, Syed Ali 1982	Rural Developement Programms in Bangladesh: A Sociological Study, Ph. D. Dessertation (Unpublished), Dhaka Univesity, Dhaka.
National Institute of Public Adminstration 1966	Bengal District Adminstration Committee 1913-14 Report,Reprint Service-4, NIPA, Dhaka.
Parvin's 2002	Garo Community of Bangladesh
Playfair, Mafar 1909	The Garos. London.
Pelto, Pertti 1970	Anthropological Research: The Structure of Inquiry, Evanstor and Lond, Happer and Raw Publishers, New York, U.S.A.

Dhaka University Institutional Repository

Rahman, Atiur 1989 — Rural Power Structure and Development: A Review Study, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Dhaka.

Raghviah (ed), 1969 — Tribes of India: Sharatiya Adimjathi, Gever Sangh Publishars, New Delhi, India.

Rahim, Abdur. M. 1963 — Social and Cultural History of Bengal, Vol-1, Pakistan Historical Society, Karachi.

Rajpul, A.B. 1965 — The Tribes of Chittagong Hill Tracts, Pakistan Publications, Karachi.

Redfiedl, Robert 1947 — The Folk Society, Jmerican Sournal of Sociology, Vol-LIX, No-4.

_____ 1960 — The Little Community and Peasant Society and Culture, University of Chicago Press, Chicago, U.S.A.

_____ 1962 — The Folk Society, Margaret Park Relfield (ed), Human Nature and the Study of Society, The University of Chicago Press, Chicago, U.S.A.

Risely, Sir Hertbert 1980 — The People of India, Calcutta, Thacker Spink and Co London.

Risely, H.H 1891 — The Tribes and Castes of Bengal: Ethnographic Glossary, Vol-1, Calcutta, Bengal Secretariat Press.

Rose J.D 1976 — Peoples: The Ethnic Dimension in Human Relations, Chicago, U.S.A.

Robinson, H. 1978 — Monsoon Asia (3rd ed.), Macdonald and Evans Ltd, Norwich.

Sattar, Abdus –1971 — In the Sylvan Shadow, Saquil Brothers, Dhaka.

_____ 1975 — Tribal Culture in Bangladesh, Muktadhara, Dhaka.

Sangma, S. Milton — History and Culture of the Garos, Books Today, New Delhi, India.

Sinha, T.C 1966 — The Psyche of the Garo, Calcutta, India.

Spradby, J.P. 1978 — An Ethnographic Interview, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Dhaka University Institutional Repository

Tylor E.B. 1874	Primitive Culture, New York, U.S.A.
1990 (Ed)	Dictionary of Anthropology, Batra Printers, New Delhi, India.
1958	The Origins of Culture, New York, U.S.A.
Upadhya, V.S and Pandey, G.	History of Anthropological Thought, Dept of Anthropology, University of Ranchi, India.
1993	
Varma, K.K. 1977	Culture, Ecology and Population, National Publishing House, New Delhi, India.
Vidyarthi, L.P. 1972	Tribal Ethnography in India: A Trend Report. M.N. Srinivas al. A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, Vol. III, The Indian Council of Social Science Research, New Delhi, India.
_____ 1961	Census of India 1961. Monograph Series, No-3, Ghaghre-A Village in Chotanagpur, Office of the Registrar General India, Ministry of Home Affairs, India.
_____ 1978	Rise of Anthropology in India, New Delhi Concept Publishing Company.
_____ 1980	Two Hundred Years of Social Anthropology in India (1774-1971): An Historical Appraisal, L.P. Vidyarthi et, al. Aspects of Social Anthropology in India. Classical Publications, New delhi, India.
Waddeli, L. Austine 1901	The Tribe of the Brahmaputtra Valley, Journal of Asiatic Society.
Willians, T. Rhys. 1990	Cultural Anthropology, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, U.S.A.
Wright, Charles, R 1975	Mass Communication A Sociological Perspective (2nd edition), Rendom House, New York, U.S.A
Zetley;s 1977	Mordarnizing Indian Peasents: A Study of Six Village in Eastern Uttar Pradesh. Asia Educational Services, India.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১
প্রশ্নমালা

গৃহস্থালী জরীপে গৃহস্থালী প্রধানের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা
ব্যক্তিগত পরিচয় (গৃহস্থালী প্রধান)

১। নাম ঃ .....

২। লিঙ্গ ঃ .....

৩। বয়স ঃ .....

৪। শিক্ষা ঃ .....

৫। পেশা ঃ .....

৬। গোষ্ঠী/গোত্র ঃ .....

৭। বংশ পরিচয় ঃ .....

Dhaka University Institutional Repository

১.০ আবাসিক অবস্থা

১। আপনার পূর্বপুরুষরাও কি এই গ্রামেই বসবাস করত, নাকি অন্য কোন জায়গা থেকে এখানে এসে আবাস গড়ে তুলেছেন?

২। কতটি পুরুনু ক্রমে আপনি এ গ্রামে বসবাস করছেন?

২.০ গৃহস্থালী

১। আপনার বাড়ীটি কেমন? -কুঁড়েঘর/কাঁচা/পাকা/কাঁচা-পাকা।

২। যে বাড়ীতে আপনি বাস করছেন এর মালিক কে?-

আপনি/আপনার মা/আপনার স্ত্রী/পিতা/আপনার দাদা বা নানা/অন্য কেউ।

৩। বাড়ীটি কে নির্মাণ করেছে?

৪। বর্তমানে এর মালিক কে?

৩.০। আপনার বাড়ী সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন

১। বসার ঘরের সংখ্যা

২। রান্নাঘর

৩। গোসল খানা

৪। ভিতরের উঠান

৫। বাইরের উঠান

৪.০। আপনার বাড়ীতে কি আলাদা জায়গা আছে?

ক) দম্পতিতের জন্য
খ) বাচ্চাদের জন্য
গ) মেহমানদের জন্য
ঘ) অসুস্থ্যদের জন্য
ঙ) গৃহপালিত পশু-পাখির জন্য
চ) গুদাম ঘর
ছ) চাষবাসের যন্ত্রপাতি রাখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

৫.০। সামাজিক সংগঠন

৫.১ আপনি কি বিবাহিত?

৫.২ আপনার বিয়ের সময় নিম্নোক্ত ঐতিহ্যবাহী বিষয়গুলোকে কি মানা হয়েছিল?

১। বর্হিগোষ্ঠীর বিবাহরীতি

২। ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান সমূহ

৩। উপহার সামগ্রী

৪। বিয়ের পরবর্তী বাসস্থান

৫.৩ কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে আপনার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে?

৫.৪ আপনি কি মনে করেন আগে বিয়ের সময় যে সব বিষয় প্রাধান্য পেত এখনও সে সব বিষয়ই প্রাধান্য পাচ্ছে?

৫.৫ বিয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে কি কি পরিবর্তন সমূহ সংঘটিত হয়েছে?

৫.৬ আপনার পরিবারে কে কে বসবাস করে?

নাম	বয়স	লিঙ্গ	গৃহস্থালী প্রধানের সাথে সম্পর্ক	বৈবাহিক অবস্থা	বিয়ের সময়কাল	বিয়ের স্থান	গোষ্ঠী	বিয়ের ধরন

৫.৭ আপনার পরিবারটি কোন ধরনের পরিবারের অর্ন্তগত?

১। অনু পরিবার

২। অনু সদৃশ্য পরিবার

৩। বর্ধিত পরিবার

৪। একান্নবর্তী পরিবার

৫.৮ পরিবারের সদস্য হিসাবে কাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করতে আপনি বেশী আগ্রহী?

৫.৯ সঙ্গী নির্বাচন করতে আপনি কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন?

Dhaka University Institutional Repository

ক) ভাইয়ের ক্ষেত্রে
খ) বোনের ক্ষেত্রে
গ) ছেলের ক্ষেত্রে
ঘ) মেয়ের ক্ষেত্রে

৫.১০ আপনার ছেলে-মেয়েদের বয়স কত?

৫.১১ কত বয়সে আপনি ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে আগ্রহী?

ঙ) ছেলেদের
চ) মেয়েদের

৫.১২ বিয়ের পর আপনি কি ছেলে-মেয়ের সাথে একই পরিবারে বসবাস করতে ইচ্ছুক?

৬.০। অর্থনৈতিক সংগঠন

৬.১ আপনার পেশা কি?

৬.২ আপনার পূর্বপুরুষদের কি একই পেশা ছিল? (পূর্ব পুরুষদের পেশা ভিন্ন হলে উল্লেখ করুন)

৬.৩ আপনি কেন পূর্বপুরুষদের পেশায় না গিয়ে বর্তমান পেশায় আসলেন?

৬.৪ আপনার কি কৃষি জমি আছে? থাকলে কতটুকু?

৬.৫ আপনি কি নিজেই জমিতে চাষ করেন? এ কাজে আপনাকে আর কে কে সাহায্য করেন?

৬.৬ জমি থেকে বাৎসরিক কি পরিমান ফসল আসে? তা আপনার প্রয়োজনের কতটা অভাব পূরণ করে?

৬.৭ আপনার পরিবারে আর কে কে উপার্জন করেন? তারা আপনাকে কতটা সাহায্য করেন?

৬.৮ উপার্জনকৃত অর্থ কিভাবে ব্যয় হয়? ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন খাতকে আপনি বেশী প্রাধান্য দেন?

৬.৯ আপনার আয় কি সংসারের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট?

৬.১০ আপনি কি কখনও ধার করেন? কেন করেন? কোথা থেকে করেন? কি শর্তের ভিত্তিতে?

৬.১১ কোন ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করেন?

৬.১২ কোন ধরনের গৃহপালিত পশুপাখি আপনার বাড়ীতে আছে?

Dhaka University Institutional Repository

দুগ্ধদানকারী পশু	গৃহপালিত অন্যান্য পশু	পাখি
মহিষ	ঘোড়া	হাঁস
গরু/গাভী	গাদা	মুরগি
ভেড়া	কুকুর	টিয়া
ছাগল	বিড়াল	ময়না
	শুকড়	কবুতর
	হরিণ	চাইনিজ হাঁস,চাইনিজ মুরগি

কোন কোন সামগ্রী আপনার বাড়ীতে আছে?

ক) আলোক সামগ্রী: কুপি/হ্যারিক্যান/হ্যাজাক/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

খ) আসবাবপত্র: চাটাই/খাট/চেয়ার/টেবিল/আলমারি/আলনা/অন্যান্য

গ) তৈজসপত্র: কাসা/এ্যালুমিনিয়াম/প্লাস্টিক/কাঁচ/ষ্টীল/সিরামিক/মাটি/ অন্যান্য

ঘ) আধুনিক সরঞ্জাম: ঘড়ি/রেডিও/টর্চলাইট/ক্যামেরা/ক্যাসেট প্লেয়ার/টিভি/অন্যান্য

ঙ) বস্ত্র সামগ্রী: শাড়ী/দকমান্দা/সেলোয়ার/কামিজ/ধুতি/লুঙ্গি/ট্রাউজার/জুতা/লেপ/তোষক/বালিশ

চ) পানির উৎস: টিউবওয়েল/ডিপটিউবয়েল/ট্যাঙ্ক/নদী/হ্রদ/অন্যান্য

ছ) চিকিৎসা ব্যবস্থা: এ্যালপ্যাথিক/হোমিওপ্যাথিক/আয়ুর্বেদিক/মন্ত্রতন্ত্র/ঐতিহ্যবাহী গারো চিকিৎসা

জ) শিক্ষা: প্রাথমিক/মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/স্নাতক/পরবর্তী

৬.১৩ অনুগ্রহ করে আপনার পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।

ক্রমিক নং	নাম	গৃহস্থালী প্রধানের সাথে সম্পর্ক	শিক্ষার ধরন		শ্রেণী
			প্রাতিষ্ঠানিক	ঘরোয়া	

Dhaka University Institutional Repository

কেসস্টাডির জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা

১। আপনার নাম কি?

২। আপনার বয়স কত?

৩। আপনি কতটুকু লেখাপড়া করেছেন?

৪। আপনার পেশা কি?

৫। আপনি কি বিবাহিত? আপনার কোন সন্তান আছে? তার বয়স কত?

৬। আপনি গারোদের ইতিহাস সম্পর্কে কি জানেন? আমাকে একটু বিস্তারিত ভাবে বলুন।

৭। আপনি কি মনে করেন গারোদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৮। আপনার কি মনে হয় গারো সমাজ জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে? ঘটে থাকলে কি কারণ এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী?

৯। আপনি কি গারো সমাজের বর্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট? সন্তুষ্ট না থাকলে গারোদের জন্য আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ানগালা উৎসবে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত সামগ্রী

গারোদের বাদ্য যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

উৎরাইল গ্রামের গারো অধিবাসী

কর্মক্ষেত্রে গারো নারী